জীবনের জটিলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছেলেমেয়েদের জলখাবারের জন্য আজ সকালে আলুভাতে রাঁধিবার সময় অনুরূপার ছিল না। বিমল ও প্রমীলার হাতে একটি করিয়া পয়সা দিয়া সে তাই বলিল, মুড়ি কিনে খাবি যা বাপু আজ, ভাত হয়নি।

পয়সাটা হাতে পাওয়ামাত্র বিমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গেল সে বিড়ির দোকানে, কিনিল এক পয়সার বিড়ি।

মুড়ি খাইলে পেট ভরে কিন্তু বিমলের নেশা নূতন—ক্ষুধার চেয়ে জোরালো। কাল সন্ধ্যা হইতে সে বিড়ি খাইতে পায় নাই। পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া পরপর তিনটা বিড়ি শেষ করিয়া সে পড়িতে বসিল।

আর ভাঙা ছাতিটি মাথায় দিয়া প্রমীলা গেল মুড়ি কিনিতে। যাইতে যাইতে দ্যাখে, ওমা এ কী ! গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তায় যে সরু নদী সৃষ্ট হইয়াছে তারই একটার তীরে চকচক করিতেছে রুপার একটা সিকি।

সিকিটা কুড়াইয়া নিয়া উত্তেজনায় প্রমীলার ছোটো বুকখানি কাঁপিতে লাগিল। সকালে ঘুম ভাঙিয়া বালিশের তলে কোনোদিনই সোনার মোহর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পথে রুপার সিকি কুড়াইয়া পাওয়া কি তার চেয়ে কম ? হঠাৎ লাখ টাকা পাইলে আমার যেমন অশান্তি হয়, চার আনা পয়সা পাইয়া মেয়েটার মন তেমনি আশ্চর্য সুখকর অশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে।

মুড়ি আর কেনা হইল না। প্রমীলা বাড়ি ফিরিল।

কী পেয়েছি দ্যাখো দাদা ! মোটর কিনব, পুতুল কিনব, আরও কত কী আমি কিনব ! বলিতে বলিতে আনন্দে প্রমীলার গলা বুজিয়া আসে।

কোথায় পেলি রে ?

রাস্তায় পড়েছিল—আমি দেখতে পেলাম !

কোন রাস্তায় পড়েছিল ?

পাঁচুদের বাড়ির সামনে।

বিমল মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, ওটা আমার সিকি, দে।

প্রমীলার মুখ শুকাইয়া গেল। এ রকম একটা অন্যায় ডাকাতির আশঙ্কা প্রথম হইতেই তাহার ছিল, কিন্তু মা অথবা বাবার বদলে দাদাই যে ডাকাত হইয়া দাঁড়াইবে এটা সে ভাবিতে পারে নাই। পলাইবার উপায় থাকিলে সে পলাইত, কিন্তু বিমল শক্ত করিয়া হাত ধরিয়া আছে।

বা রে, আমি যে কুড়িয়ে পেলাম !

বিমল বলিল, তুই কুড়িয়ে পেলে কী হবে—ওটা আমার সিকি। কাল সন্ধ্যাবেলা আমার হাত থেকে ওখানে ওটা পড়ে গিয়েছিল। দে—দে বলছি, মিলি, সিকি !

এমনিভাবে বাঁধিল কলহ। গোলমাল শুনিয়া অনুরূপা ব্যাপার দেখিতে আসিয়া সিকিটি আঁচলে বাঁধিয়া আবার রাঁধিতে গেল। বিমল অবশ্য মার পিছুপিছু ধাওয়া করিয়া গেল রান্নাঘর পর্যন্ত, কিন্তু অনুরূপার কাছ হইতে একটা সিকি আদায় করা তার কর্ম নয়। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল প্রমীলা কাঁদিতেছে। মনটা বিমলের বড়ো খারাপ হইয়া গেল। চার আনা পয়সা হাতে আসিলে প্রমীলার কান্নায় বিচলিত হইত কি না কে জানে—এখন মুখখানা তাহার বিষণ্ণ দেখাইতে লাগিল। ছোটো বোন—তার প্রতি একটা গভীর অন্যায় যে করিয়াছে শুধু তাই নয়—মিছামিছি নিজেকে সে হীন করিয়াছে একেবারে অকারণে।

প্রমীলার দুঃখ অবর্ণনীয়। একটি স্প্রিং দেওয়া মোটরের সাধ অনেকদিনের, চার আনা পয়সা দিয়া মোটর তো কেনা যাইতই, পুতুলও কেনা যাইত,—আর দু পয়সার লেবেঞ্চুস। দাদা এ কী করিল ! মাঝে মাঝে চালাইতে চাহিলে দাদাকে সে কী মোটরটা চালাইতে দিত না ? লেবেঞ্চুসের ভাগ দিত না ? ও রকম করিয়া দাদার তবে লাভটা হইল কী ?

দাদার এই লাভের হিসাবটা প্রমীলা কোনোদিন বুঝিতে পারে না। সে দিন জলের কলসি ভাঙিয়া ফেলার কথাটা মাকে বলিয়া দিয়া ওর লাভ কী হইয়াছিল ? স্কুল হইতে রঙিন মলাটের ছবির বই আনিয়া সে তাহাকে দেখিতে দেয় না—অনেক পায়ে পড়িলে দেয়। সে তার পুতুল লুকাইয়া রাখে, তাকে মিছামিছি কাঁদায়, তার চুল ধরিয়া টানিতে ভালোবাসে। কেন যে এসব করে ?

অনুরূপার অবশ্য নিত্য খরচের টানাটানি, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ে যে সিকিটা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে এবং যেটা কাড়িয়া নেওয়ায় আকুল হইয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছে সেটা সংসার খরচে লাগানোর মতো কঠিন মন তার নয়। বিকালে বিমলকে সে চার আনার মিষ্টি আনিতে দিল।

বিমল ঘুরিয়া আসিয়া সিকিটা ফেরত দিল, অচল। যেটিকে উপলক্ষ করিয়া এত কাণ্ড হইয়া গেল তার দাম সিকি পয়সাও নয়। সিকিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া অনুরূপা বলিল, নে মিলি, তোর সিকি তুই নে তবে।

প্রমীলা বলিল, চাইনে। আমার ভালো সিকি নিয়ে খারাপ দেওয়া হচ্ছে।

তবে তুই নে।

বিমল বিনা প্রতিবাদে সিকিটা গ্রহণ করিল। পরে কাজে লাগিবে। কীভাবে লাগিবে ইতিমধ্যেই সে তাহা ভাবিয়া ফেলিয়াছে।

পরদিন রথ দেখার জন্য বিমল দু আনা পয়সা পাইল। মেলায় পৌঁছিল চারিটি পয়সা। পথে সে এক পয়সার বিড়ি কিনিয়াছে, আর তিন পয়সার জিলাপি খাইয়াছে। মেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে সে বারকয়েক অচল সিকিটা চালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেটা এমনই অচল যে কোনোমতেই চলিল না।

ভাব তাহাদের দুপুরবেলাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিমলের অনুতাপ কমে নাই। জেলপলাতক কয়েদির মতো সর্বদা অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থায় ধরা পড়িবার ভয় মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে। কয়েকটি স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু তাদের সঙ্গ ভালো লাগিল না। দাঁড়াইয়া সে খানিক যাত্রা শুনিল। ওদিকে পুতুলনাচ হইতেছিল, প্রমীলা আর বাবাকে সেখানে দেখিয়া সে তাব কাছে গেল না। যেখানে সকলে ভিড় করিয়া বালা খেলিতেছিল সেখানে গিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কতক্ষণ খেলা দেখিয়া সে চার পয়সার চারিখানা বালা কিনিল। চৌকিতে লাল শালুর উপরে কত টাকা আধুলি সিকি দুয়ানি ছড়ানো ! ওর একটা সিকি যদি সে জিতিতে পারে তাহা হইলে প্রমীলার কাছে হঠাৎ যে বিশ্রী অপরাধ সে করিয়া ফেলিয়াছে তার প্রায়শ্চিত্তের উপায় হয়। পয়সা সে নিবে না, বলিবে, একটা রুপার সিকি দাও। সিকিটা যাতে অচল না হয়, খুব ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

সে একটা দুয়ানি জিতিল। কিন্তু তার প্রয়োজন সিকির, দুয়ানি দিয়া সে করিবে কী ! বিমল আরও বালা কিনিল, খুব সাবধানে দ্যাখে—বালাটা টাকার উপর দিয়া সিকির উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া ছুঁড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি বালা ছোঁড়ে আর ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া টাকা আর আধুলি সিকি দুয়ানির ভিড়ের মধ্যে সংকীর্ণতম ফাঁকা স্থানটুকু বাছিয়া নিয়া স্থির হয়।

শেষে বিমলের সবগুলি বালা ফুরাইয়া গেল। বিমলের কান্না আসিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্যে তার নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। মুখ আমসির মতো শুকাইয়া গিয়াছে।

সকালে যা করিয়া ফেলিয়াছে সেটা ফিরাইয়া লইবার কোনো উপায়ই নাই, এইটুকুই তার কাছে অতি ভয়ানক মনে হয়। সে এখন যাই করুক, রাস্তায় মাথা খুঁড়ুক, না খাইয়া মরিয়া যাক, কিছুতেই আর সকালবেলার ব্যাপারটার প্রতিকার করা যাইবে না।

এ কী নিষ্ঠুর উপায়হীনতা !

কয়েকদিন পরে অনুরূপা একটা টাকা দিয়া বিমলকে মুদির দোকানে জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছে ; দেখা গেল ফেরত পয়সার মধ্যে আনিয়াছে একটা অচল সিকি। প্রমথ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ মুদির কাছে গেল বটে, কিন্তু সিকি সে ফেরত নিল না।

বিমল ধরা পড়িল পরদিন। সাত বছরের মেয়ের অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সন্দিগ্ধা অনুরূপা জেরা আরম্ভ করাতে সব প্রকাশ হইয়া গেল। এত পয়সা তুই কোথা পেলি রে মিলি !

দাদা দিয়েছে।

কত দিয়েছে ?

চার আনা। কী বললে জান মা ! বললে, নে মিলি, তোকে দিলাম, মোটর কিনিস।

সে রাত্রে ভাইবোনের জ্বর আসিল। ওষুধে ডাক্তারে প্রমথের সাতাশ টাকা খরচ হইয়া গেল।

পথে কুড়াইয়া পাওয়া একটা অচল সিকিকে আশ্রয় করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া যায়। এমনই মানুষের জীবন, এমনই জীবন মানুষের !

তখন অনুরূপার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সেদিন মুদির দোকানের ফেরত পয়সার অচল সিকিটা কোথা হইতে আসিযাছিল। বিমলকে সে এমন মার মারিল বলিবার নয়। কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে অচল একটা সিকি যদি বিমল কৌশলে তার ঘাড়ে চালান করিয়া দিয়াই থাকে কাজটা সে করিয়াছে বোনের জন্য—মিলির জন্য। পয়সা চার আনা সে তো নিজের জন্যও রাখিতে পারিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সারা বিকালটা ঘুরিয়াও পাঁচটা টাকা জোগাড় করা গেল না। আবার নগেনের কাছে হাতপাতা ছাড়া উপায় নাই।

কিন্তু নগেন এখন ক্লাবে গিয়াছে নিশ্চয়, আটটা নয়টার আগে বাড়ি গেলে তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিমল বাড়ি ফিরিল।

গলির নাম জীবনময় লেন, দু পাশের বাড়ির চাপে বহুকাল জীবন ত্যাগ করিয়াছে—শবের মতো শীতল। বারচারেক দিক পরিবর্তন করিয়া এই গলি যে পুরাতন বাড়িটির বাহিরের জীর্ণ দরজায় শেষ হইয়াছে সেই বাড়িতে প্রমথ আজ সাত বৎসর সপরিবারে বাস করিতেছে। প্রমথ এখন ভালো চাকরি করে, একশো সতেরো টাকা মাহিনা ; কিন্তু ছেলেমেয়ের সংখ্যা উপার্জনের অনুপাতে বেশিই বাড়িয়াছে। সুতরাং অনুরূপার খরচের টানাটানি কমে নাই।

ছেলে যে মানুষ হইল না। নইলে কি এত কষ্ট হয়। প্রত্যেক মাসের শেষের দিকে অনুরূপা আজকাল এই কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। কথাটা বিমলের কানে যায়, কিন্তু মনে লাগে না। লাগিলেও লাভ নাই। উপার্জনের পথ পাইলে তো সে উপার্জন করিবে ? আকাশে টাকা নাই, হাত বাড়াইলে দুই হাতের অঞ্জলি টাকায় ভরিয়া যায় না। পাঁচটা টাকার জন্য সারাটা বিকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেও একটা টাকার জোগাড় হইয়া উঠে না। সে করিবে কী ?

বিমল যখন বাড়ি ফিরিল, প্রমীলা আর শান্তা রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতেছে। শান্তা চওড়া লালপাড় শাড়ি পরিয়াছে। এ যেন তার প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা।

কোথায় টোটো কোম্পানি করে এলেন ? প্রমীলা বলিল, সম্পাদকদের বাড়ি বোধ হয় ?

শান্তা হাসিয়া বলিল, ওমা, সে কী ? এখনও সম্পাদকেরা আপনার বাড়িতে এসে ধরনা দেয় না ? অতগুলি কবিতা ছাপলেন !

বিমল নীরসকণ্ঠে বলিল, কতগুলি কবিতা ছাপলাম ?

সতেরোটা।

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি কতগুলি কবিতা ছাপলাম তার হিসেব রাখার জন্য আপনি খাতা খুলেছেন নাকি ?

না, যে কবিতা পড়তে প্রাণ বেরিয়ে যায়, তার কটা পড়লাম তা এমনি হিসেব থাকে।

আমি কাউকে আমার কবিতা পড়তে মাথার দিব্যি দিইনি।

কিন্তু জীবন দিয়েছেন। কবিতা লেখার জন্য নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করলেন, সে বুঝি মাথার দিব্যি দেওয়ার চেয়ে কম ?

এ নিন্দা, না প্রশংসা বোঝা দায়। সোজাসুজি নিন্দা করিলে বিমলের ভালো লাগিত।

যাই হোক, আপনার ঠিক হয়নি। আমি কুড়িটা কবিতা ছেপেছি।

বিমল পকেট হইতে দুটি মাসিকপত্র বাহির করিল। এতখানি আগ্রহের সঙ্গে শান্তা সে দুটি আয়ত্ত করিয়া নিল যে বিমলের মনে হইল, যতকাল বাঁচিবে রাতদুপুরে বিনিদ্র বেদনা ও অসহ্য আবেগের পীড়ন সহিয়াও সে প্রত্যহ কবিতা লিখিবে। শান্তার সিঁথির সিঁদুরের মতো উদ্ধত কল্পনা নয়, শান্তার হাসিটির মতো ম্লান স্তিমিত ভাবসম্পদ আজ হইতে তার কবিতায় যেন প্রাণবন্ত হয়।

আজ আপনার দু বার প্রাণ বেরোবে।

প্রমীলা বলিল, দু বার কারও প্রাণ বেরায়?

শান্তা বলিল, কারও কারও বেরোয় ভাই, দুবার ছেড়ে দশবাব বেরোয়। বলে, পলকে পলকে কত লোকের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে!

বিমল বলিল, যেমন আমার।

শান্তার কথা শেষ হইতেই প্রমীলা ডালের অবস্থা দেখিতে রান্নাঘরে গিয়াছিল, নহিলে এ কথা বলিবার সাহস বিমলের হইত না।

শান্তা নির্বিবাদে বলিল, আপনি যে দুঃখবাদী কবি, আপনার কবিতা পড়লেই সেটা বোঝা যায়। সারাদিন ছিলেন কোথায়?

সারাদিন মানে যদি তিনটে থেকে হয়, টাকার খোঁজে পথে পথে ঘুরছিলাম।

আর আমি আজ সারাদিন টাকার বোঝা বয়ে ঘুরছি। শান্তা আঁচল খুলিয়া দেখাইল। অনেকগুলি নোট।—ধার নেবেন?

ধার কেন, দান করুন না?

নেওয়া যায় না, নিতে নাই, কিন্তু নিতে সে অনায়াসে পারে। ও টাকা শান্তার স্বামী উপার্জন করিয়াছে, তবু নেওয়া যায়। শান্তা খুশি হইবে। শান্তা পরিহাসের মতো করিয়া ধার দিতে চাহিল, সে পরিহাসের মতো করিয়া নিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু শান্তার দেওয়ার আগ্রহ ও তার নেওয়ার প্রয়োজন কোলাকুলি করিল নেপথ্যে।

শান্তা বলিল, আপনি কবি নন। কবি হলে নিতেন। টাকা কারও নয়, যার দরকার হয় তার। আপনার খিদে পেলে আমি খেতে দেব, আপনি খাবেন। তাতে দোষ নেই। টাকার দরকার হলে আমি দেব, কিন্তু আপনি নেবেন না। এটা ঠিক নয়। দরকারের হিসেবে খাবারও যা, টাকাও তাই।

বিমল বলিল, ওটা থিয়েটারি। ওগুলি স্বীকার করা যায়, পালন করা যায় না। আপনি সেদিন স্বীকার করলেন পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে পাপ করতে পারেন?

খুব পারি। আমি ঢের পাপ করেছি।

বিমল বলিল, পাপ কাকে বলে আপনি তা জানেন না।

তবে আমার খুব সুবিধা। না জেনে যত খুশি পাপ করব—পাপ হবে না।

প্রমীলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। তার সামনে শান্তা এ কথাটা না বলিলেই বিমল খুশি হইত।

প্রমীলা বলিল, আমার উনুনে একবার না জেনে হাত দেবে চল, দেখবে হাতটা ঠিক পুড়ে যাবে।

শান্তা আশ্চর্য হইয়া বলিল, তা যাবে না? যাবেই তো!

জানালা-প্রেমটা সাধারণত বাজে প্রেমের পর্যায়ে পড়ে। ও যেন পাশাপাশি দুটি বাড়ির বিশেষ অবস্থানের সুযোগ নিয়া দুপক্ষেরই পরস্পরের সঙ্গে একটু তামাশা করা। কিন্তু কতগুলি কারণে বিমলের প্রেমটা বাজে হইয়া যায় নাই। সবচেয়ে বড়ো কারণটা অবশ্য তাহার হৃদয়, কিন্তু তেইশ বছরের একটা অপদার্থ ছেলের হৃদয়ের কথাটা সংসারের অভিজ্ঞ লোকেরা সসন্দেহে মাথা নাড়িবে। অর্থাৎ, না হে বাপু লেখক, ওটা হৃদয় নয় ফাজলামি।

ছোটো কারণগুলির মধ্যে একটা হইল এই যে শান্তাকে ভালোবাসার চেয়ে ঢের সহজে ও সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে অন্য কাহাকেও ভালোবাসার সুযোগ বিমলের ছিল। এমন কী, বি এ পাস অত্যন্ত আধুনিক একটি মেয়েকে ভালোবাসিয়া সে অনায়াসে নিজের জীবনে খুব একটা রোমান্টিক বিবাহ ঘটাইয়া ফেলিতে পারিত। আত্মীয়স্বজনের বিস্ময় ও ত্রাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কপর্দকহীন কবি-স্বামীকে নিয়া খেলার ঘরের উপন্যাস সৃষ্টি করিতে লাবণ্য আজও রাজি আছে এবং বিমল তাহা জানে। তবু শান্তাই তাহাকে জয় করিয়াছে;—বয়েল বিডার-পড়া পরের বউ গেঁয়ো মেয়ে শান্তা। জীবন একটা অদ্ভুত কাব্য।

আর একটা কারণ বৈচিত্র্য। ঠিক যে বৈচিত্র্য তাহা নয়, কারণ যত বিচিত্রই হোক ছয় মাস ধরিয়া ব্যাপারটা একভাবে দিনের পর দিন একটানা ঘটিয়া চলিয়াছিল।

প্রথম আরম্ভ হয় বর্ষাকালের এক মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে। সারা সকাল শান্তার জানালা বন্ধ ছিল। বন্ধ জানালার ওদিকে বেলা দশটার সময় বিমল পুরুষকণ্ঠে খুব তর্জনগর্জন শুনিয়াছিল। তারপর সব চুপচাপ হইয়া যায়। শান্তা কখন জানালা খুলিয়াছিল বিমল দ্যাখে নাই, দেখিলে তাড়াতাড়ি গেঞ্জি গায়ে দিত। একটা স্বপ্নবিভোর ঘুম দিয়া উঠিয়া বাস্তব স্বপ্নের মতো শান্তাকে সে আবিষ্কার করে।

পিঠে এলানো চুল, গায়ে সাদা শেমিজ আর পরনে নীলাম্বরী, আকাশের মেঘের গাঢ়তর প্রতিবিম্বের মতো। চোখ তুলিয়া শান্তা একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর চোখ নামাইয়া বসিয়া রহিল। সরিয়া গেল না। বিমল আশ্চর্য হইয়া গেল।

সেই যে তাহাদের নির্বাক পরিচয় শুরু হইল ছয় মাসের মধ্যে তাহা না নিল রূপান্তর, না গেল থামিয়া। সকালে শান্তার জানালা বন্ধ থাকে। সাড়ে দশটায় অধর অফিসে গেলে জানালা খুলিয়া শান্তা আধঘণ্টাখানেক চুপচাপ জানালায় বসিয়া থাকে, তারপর স্নান করিয়া খাইয়া বিমলের দৃষ্টির অন্তরালে খাটে শুইয়া ঘুমায়। আবার জানালায় আসে বৈকালে রোদের তেজ যখন কমিয়া আসিয়াছে, পশ্চিমে বড়ালদের চারতলা বাড়ির সুদীর্ঘ ছায়াটি যখন গড়াইয়া শান্তার জানালার গোড়ায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বিমলের দিকে সে কখনও তাকায় না। দিনের পর দিন বিমলের সাহস যে বাড়িতেছে, ক্রমে ক্রমে সে যে একেবারে নিজের জানালার কাছে চেয়ার সরাইয়া আনিয়া প্রকাশ্যভাবে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ বিষয়ে সে যেন সচেতন নয়। পাছে সচেতন না হইয়া আর উপায় থাকে না, এই জন্যই সে যেন বিমলের দিকে তাকায় না।

মাঝে মাঝে শান্তা প্রমীলার কাছে আসে, কিন্তু বিমলকে দেখিলে ঘোমটা টানিয়া দেয়। বিমলকে মুখ দেখাইতে তার যেন লজ্জা করে। তার মুখ সে যেন চিরকালের জন্য বিমলের দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চায়।

ভাবিয়া ভাবিয়া বিমলের মাথা ঘুরিয়া যায়। এ কী ব্যাপার? শান্তা যদি পাগল না হয় তবে এর কী সংগত ব্যাখ্যা করা চলে? প্রমীলার কাছ হইতে সে তার কবিতার খাতা নিয়া ফেরত দিতে চায় না, প্রমীলার মুখে তার কথা শুনিতে সে ভালোবাসে, তারই জন্য সে প্রত্যহ জানালায় আসিয়া বসে, তবু তাহাকে দেখিয়া সে ঘোমটা দেয় কী হিসাবে? একবার চোখাচোখির সুযোগ দেয় না কেন? কথা বলিবার সাহস যাহাতে তাহার হয়, তার সামান্য একটু প্রেরণা দিতেও ওর এতখানি কার্পণ্য কেন? সারাটা জীবন তার চোখের সামনে ওইভাবে জানালায় বসিয়া কাটাইয়া দিতে চায় নাকি? অত কাছে আসিয়াও সুদূর গ্রহবাসিনীর মতো এই অবিশ্বাসী দূরত্ব ও কী কোনোদিন কমিতে দিবে না?

শেষে একদিন বিমল কথা বলিল।

আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল অবস্থাতেই নির্দোষ।

শান্তার মুখ বিশেষ শুকনো দেখাইতেছিল না, বিমলের প্রশ্নেই বরং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

কই, না? বলিয়া সে জানালা ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

বিমল সভয়ে একবার বলিল বটে, রাগ করলেন? কিন্তু তার কোনো জবাব আসিল না।

তারপর কয়েকদিন শান্তার আর দেখা নাই। প্রথমটা বিমলের ভারী অনুশোচনা হইল, শেষে সে রাগ করিয়া ভাবিল, ভালোই হয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। কাল থেকে দু বেলা লাবণ্যদের বাড়ি যাওয়া যাবে।

কিন্তু সেইদিন বিকালে প্রমীলার কাছে বেড়াইতে আসিয়া শান্তা বিমলেব সঙ্গে একেবারে আলাপ করিয়া গেল। কদিন ভাবিয়া শান্তা বুঝিতে পারিয়াছিল, যার চোখের ভাষা স্বীকার করিতে হয়, তার মুখের কথাটা ঠেকাইবার উপায় নাই। ঠেকানো ন্যায়সংগতও নয়। কবিতার বই কিনিতে যেমন কিছু পয়সা লাগে, জীবনে কাব্যের আমদানি করিতেও কিছু মূল্য দিতে হয়।

অর্থাৎ যুক্তি ও সমর্থন আবিষ্কার করামাত্র শান্তা নিশ্চিন্তমনে কাম্য অবস্থাটি বরণ করিয়া নিল। এর মধ্যে কোনো জটিলতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিল না। মনে মনে বলিল, বাঃ, আমাকেও বাঁচতে হবে ?

তারপর শান্তা বলিল, কী মজা হয়েছিল শোনো ভাই।

প্রমীলা বলিল, আমার ডাল পুড়ে যাবে।

কত লোকের কপাল পুড়ছে, তোমার না হয় একটু ডাল পুড়ল।

কথায় কথায় কত লোকের কত কী হচ্ছে। তুমি লোকটা যেন কী রকম ভাই।

স্পষ্ট বল না কেন, পাগল ! শান্তা একটু হাসিল।

আমি বলি আর না বলি, দাদা মাঝে মাঝে বলে। তবে স্পষ্ট করে বলে না, দারুণ সন্দেহে আমায় জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে মিলি, তোর বন্ধু পাগল নাকি ?

তখন প্রমীলার দাদাকে নিয়া তাহারা খানিকক্ষণ আলোচনা করিল। সে আর কী বলে ? সে আর কী করে? এক-একদিন অত রাতে বাড়ি ফেরে কেন ? সেদিন শান্তা খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়াছে নাকি ?

আলোচনা থামিল হঠাৎ। প্রমীলা ডাল নামাইতে গেল এবং শান্তার লজ্জা করিতে লাগিল। পরের দাদাকে নিয়া কি অত আলোচনা চলে ? প্রমীলা ফিরিয়া আসিলে সে আবার বলিল, কী মজা হয়েছিল শুনলে না ?

প্রমীলা বলিল, বল।

শান্তা বলিল, বিয়ের আগে মামার বাড়িতে ছিলাম, সে তো তুমি জান, তোমায় বলেছি। একদিন আমাব খুব জ্বর হল। খাই না দাই না, চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকি, মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে যাই। সকালের ওষুধ কেউ দুপুরে খাইয়ে যায়, দুপুরের বার্লি কেউ সন্ধ্যার সময় এনে বলে, খা লো বার্লি খা। এখন তেষ্টা পেলে জল পাই একঘণ্টা পরে।

প্রমীলা মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, কী বাড়িয়েই বলতে পারে, বাঃ!

এদিকে, ঠিক সেই সময় মামিমার টিয়াপাখিটারও কী যেন অসুখ—খায়দায় না, ঘাড় গুঁজে আমার মতো ঝিমায়। একদিন শুনি মামিমা বারান্দায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, হে ভগবান, ওকে আমার ভালো করে দাও, আমি সওয়া-পাঁচ-আনাব হরিলুট দেব। শুনে আমি তো চমকে উঠলাম। মামিমার মনে এত দরদ ! আস্তে আস্তে মামিমাকে ডাকলাম। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কেঁদো না মামিমা আমি ভালো হয়ে যাব।

প্রমীলা হেসে বলিল, মামি কী বললে ?

মামির কথা আর নাই বা বললাম ! শান্তা হাসিল না। অতীতের এমন একটা হাস্যকর স্মৃতি মনে আসিলেও তার হাসি পায় না।

বিমল যখন নীচে নামিয়া আসিল, শান্তা বিদায় নিতেছে। বিমলের মনে হইল, শান্তা কেবলই বিদায় নেয়। সে যে কখন আসে, জানিবার উপায় নাই। শুধু যাওয়াটাই চোখে পড়ে।

তার আঁচলের এক কোণে চাবি বাঁধা, অন্য কোণটা খালি।

বিমল সহজভাবে বলিল, টাকা ফেলে যাচ্ছেন।

ওমা !

শান্তা নোটগুলি কুড়াইয়া নিল। একটু হাসিয়া বলিল, নিজে রোজগার করি না কী না, টাকায় দরদ নেই।

বিমল ভাবিল, এ কথাটা ও না বলিলেই ভালো কবিত। আজ তার টাকার এত দরকার, টাকা সম্বন্ধে এতখানি উদারতাব অভিনয় আজ কী ওর কবা উচিত ? সে তো অনায়াসে নিজেকে অপমানিত মনে করিতে পারে !

শান্তা চলিয়া গেলে প্রমীলা ভ্রু কুচকাইয়া বলিল, বগলদাবা করে ওটা কী নিয়ে যাচ্ছ দাদা ?

তা দিয়ে তোর দরকাব কী ?

আমার কিছু নয় তো ?

দিন দিন তুই বড়ো বেয়াদব হচ্ছিস মিলি।

প্রমীলা চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলিল, কী করব বল, না হয়ে উপায় নেই। মাকড়িটা যাওয়ার পর থেকে নিজের জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমাকে একটু সাবধান থাকতে হয়।

ক্ষণকালের জন্য মনে হইল ছেলেবেলার মতো বিমল হয়তো আজ এত বড়ো বোনকে মারিয়া বাসিবে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল।

কাল তোর মাকড়ি এনে দেব।

মাকড়ির জন্য আমার ঘুম আসছে না। বলিযা প্রমীলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমীলার মাকড়ি সে চুরি করে নাই, ধার নিয়াছিল। না বলিয়াই নিয়াছিল অবশ্য, কিন্তু কয়েকদিনের জন্য বোনের মাকড়ি না বলিয়া নিলে কি চুরি করা হয় ? এমন সম্পর্ক ভাইবোনের ? বিমলের ইচ্ছা হইল কথাটা পরিষ্কার করিয়া নেয়। রান্নাঘরের দরজায় গিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুই কি সত্যি আমাকে চোর মনে করলি মিলি ?

কিন্তু প্রমীলাকে কিছু না বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

মোড়ের মুদি দোকানে খবরের কাগজের বান্ডিলটা বিক্রি করিয়া পাঁচটা পয়সা পাওয়া গেল। বিমল এক পয়সায় একটা সিগারেট কিনিল। চার পয়সা ট্রামে লাগিবে।

ট্রামে পয়সা লাগিল না। কন্ডাক্টর টিকিট চাহিলে সে গম্ভীর গলায় বলিল, পাস। সবদিন এ ফিকির খাটে না, কিন্তু আজ খাটিল। কন্ডাক্টর নীরবে নিজের স্থানে ফিরিয়া গেল।

এতক্ষণে বিমলের মনে হইল সে সত্যসত্যই চারটা পয়সা উপার্জন করিয়াছে।

নগেনের বাড়িটা প্রকাণ্ড সামনে বাগান আছে। বাগানের আকৃতিতে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া ভারী চমৎকার দেখায়। বাড়ির ডানদিক ঘেঁষিয়া অন্যলোকের বাড়ি, বাঁদিকে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েক হাত চওড়া গোলাপের ফুলশয্যা। বৎসরের কোনো কোনো সময় দোতলায় নগেনের ঘরে গোলাপের গন্ধ উঠিয়া আসে।

দমদমের কাকিমা আসায় নগেন আজ ক্লাবে যাইতে পারে নাই। দমদমের কাকিমা অত্যন্ত অভিমানিনী।

যেমনি অভিমানিনী তেমনি রূপসি। তিনি যেন একটা হ্রস্ব দীপশিখা। দেখিলে মনে হয় তিনি যে তিলোত্তমা নন, সে শুধু বেঁটে বলিয়া। গয়না পরিতে খুব ভালোবাসেন। ছোটো মেয়েটির মতো দেখাইত বলিয়া গয়না পরিলে তাহাকে মানায়ও।

প্রথম হইতেই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, নগেনকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, তোমার কাকা বড়ো দুঃখ করেন, নগেন।

কেন কাকিমা ?

তুমি যাও না বলে বলেন, নগেন আমাদের পর করে দিয়েছে—আমার অসুখ হলেও দেখতে আসে না।

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল, যাব যাব করি কাকিমা, সময় হয়ে ওঠে না।

কাকিমা গলার স্বর এমন করিয়া ফেলিলেন যেন অনুপস্থিত স্বামীর চেয়ে নগেনই তাহার বেশি আপনার।

কী জান বাবা, এমন দুর্বল প্রকৃতি ওর, কেউ না গেলে মনে করেন মিশুক স্বভাব নয় বলে ওকে অবহেলা করা হচ্ছে। ওকে নিয়ে আর পারি না। সারাদিন মন খারাপ, উঠতে বসতে সোয়াস্তি নেই, কেবলই হাই তুলছেন, শরীর খারাপ হচ্ছে—

কাকিমা থামিলেন। কথা শুনিবার সময় নগেন এমন নির্বোধের মতো মুখের ভাব করিয়া থাকে বলিয়া ইহাকে কিছু বলিতে কী রকম যেন ভয় করে। মনে হয় কথা যেন ও শুনিতেছে না, কথার পিছনে মনটাকে দেখিতেছে।

নগেন বলিল, এবার থেকে হরদম কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাব কাকিমা।

শেষ হওয়া কথার রেশ ধরিয়া এমন অবাস্তব কথা বলে বলিয়া নগেনকে কিছু বলিতে আরও ভয় হয়। কাকিমা হাসিবার ভান করিয়া বলিলেন, আর গিয়েছ? কাল বাদে পরশু তো তুমি চললে লখনৌ।

কালকেই যাব কাকিমা।

কাকিমা চমকাইয়া বলিলেন, কালকেই চলে যাবে?

লখনৌ যাবার কথা বলছি না। কাল কাকার সঙ্গে দেখা করত যাব।

যেও, বলিয়া কাকিমা একরকম জোর করিয়া স্বামীর স্বাস্থ্যের কথাটা আবার টানিয়া আনিলেন। বলিলেন, ওঁর শরীরের অবস্থা দেখে বড়ো ভাবনায় পড়েছি বাবা।

নগেন গম্ভীর হইয়া বলিল, কাকা পরিশ্রম বড়ো কম করেন।

মানে, সে বলিতে চায় তার সঙ্গে লখনৌ হাওয়া বদল করিতে যাওয়ার দরকার নাই, এখানে থাকিয়া একটু পরিশ্রম করিলেই সজনীর শরীর ভালো হইয়া যাইবে। কিন্তু কাকিমা কথাটা বুঝিবার নমুনা দেখাইলেন না। বলিলেন, কম কী, একবারেই করেন না। বেড়াতে যেতে পর্যন্ত ওঁর আলস্য। দিনের মধ্যে অমন পঞ্চাশবার বলি, ওগো, অমন চুপচাপ বসে থেক না, একটু কিছু পরিশ্রম কর, নইলে শরীর টিকবে কেন? তা বলেন, উৎসাহ নেই। কেন তা থাকবে না বল তো ? আমার চেয়ে উনি পাঁচ বছরের বড়ো, ওঁর বয়স এই তেত্রিশ। এই বয়সে মানুষ অমন মনমরা নিরুৎসাহ হয়ে যাবে? সারাদিন হয় নভেল পড়ছেন, নয় কড়িকাঠের দিকে হাঁ করে চেয়ে মাথামুন্ডু ভাবছেন, আর নয়তো আমার সঙ্গে করছেন ঝগড়া। আর নয়তো মুখের ভাব এমন করে বসে আছেন যেন আজকেই ওর বউ মরে গেছে। তুমিই বল, এ কারও সহ্য হয় ?

নগেন মৃদুস্বরে বলিল, আমি জানি কাকিমা, কাকা বড়ো sensitive।

কাকিমা মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেলেন :

তুমি কিছুই জান না বাবা। আমাব যে কী দুরদৃষ্ট! সেদিন পশ্চিমে যাওয়ার সব ঠিক করলেন, এক বছর দেড় বছর ঘুরবেন। অতদিনেব জন্য ওই মানুষকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি? বললাম, দু-একমাসের জন্যে হয়তো একাই যাও, নইলে আমি সঙ্গে যাব। এই নিয়ে ঝগড়া হল তিন দিন। তারপর পশ্চিমে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন, তবু আমায় নিতে বাজি হলেন না। কিন্তু একবার হাওয়া বদলানো ওঁর বড়ো দরকার বাবা। কী যে কবি আমি, বিষই খাই, না গলাতে দড়ি দিই—

বুঝিতে বলিযাই বলা, যে সামান্য ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হইল তার সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পবিষ্কার বুঝিয়া নিতে যদি কেউ পারে নগেনই পাবিবে কাকিমার এই বিশ্বাস এবং আশা। সত্যকথা বলিতে কী, নগেনেব বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সেটা অনুমান কবিয়া কাকিমার গাল আপেলের মতো লাল হইয়া উঠিল।

সমস্যা তাহার সহজ নয়। এক কথায় জবাব দেওযা যায না। অথচ এখনই কিছু বলা দরকার। কারণ, আজ অন্তত কাকিমার সমস্যার কী সমাধান সম্ভব, সে বিষয়ে আলোচনার একটু সূত্রপাত করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে কাকিমাও আর এ কথা তুলিতে পাবিবেন না, সেও পারিবে না।

নগেন চিন্তিত মুখে দাঁড়াইযা রহিল। এ রকম চিন্তা কবা তাব অভ্যাস আছে। নিজের জীবনে তাহার বৈচিত্র্য আছে, সমস্যা নাই। কারণ, নিজের হৃদয় সম্বন্ধে এই সুদর্শন যুবকটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

নগেন ভাবিয়া দেখিল, কাকিমার ইচ্ছাটি বিশেষ জটিল নয। তিনি কিছুদিনেব জন্য স্বামীবিরহ প্রার্থনা করেন এবং সেই অবসরে স্বামীর স্বাস্থ্য ফিবিযা আসে এই ইচ্ছা রাখেন। অর্থাৎ সজনী নগেনের সঙ্গে চলিয়া যাক হাওয়া পরিবর্তনে এবং শিখিয়া আসুক যাব সঙ্গে সে অমন ঝগড়া করিত সে স্ত্রীব কতখানি দাম।

এই শেয ইচ্ছাটাই কাকিমার সকল লজ্জার উৎস। আজ পনেরো বৎসর তাহাদেব বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনের জন্য তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইযাছিল কিনা স্মরণ করা যায় না। কাকিমার বাপের বাড়ি নাই। ভালোবাসা কোনো পক্ষেরই কম নয়, কিন্তু দীর্ঘ মিলনটা আর তাহাদের সহ্য হইতেছে না—বিশেষ করিয়া সজনীর। দু পক্ষেরই পাওযা এত জমিয়া গিয়াছে যে, চাওয়ার আর কিছু অবশিষ্ট নাই, সে সাহসও হয় না। এবং কাকিমার চেয়ে সজনীই সর্বাংশে বেশি ভীরু।

কাকিমাকে লজ্জা না দিয়া নগেনকে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশলটা এখনই খানিক প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু যাই সে বলুক, লজ্জা কাকিমা পাইবেনই। বিষয়টা যে লজ্জার। নগেন ভাবিয়া দেখিল কাকিমার লজ্জা নিবারণ করা যায় না, কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে একা একা লজ্জা পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

কাকিমাকে দেখাইয়া সে ঘড়ির দিকে চাহিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল, আমার একবার বাইরে যেতে হবে কাকিমা, দেরি হয়ে গেল। কাল দমদমায় গিয়ে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে আসব।

কাকিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আচ্ছা।

নগেন বলিল, আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে লখনৌ গেলে কাকার শরীর ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু পরশু যদি আমরা যাই আপনি যাওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারবেন না। যাওয়ার হাঙ্গামা তো কম নয়। কাকাকে তা হলে একাই যেতে হবে, যাই হোক, কাল পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করা যাবে কাকিমা।

নগেন আর দাঁড়াইল না।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিবেন, না কাঁদিবেন, কাকিমা ভাবিয়া পাইলেন না! শেষে একটা ঢোঁক গিলিয়া তিনি সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, জুতা বদলাইয়া নগেন যখন বাইরে যাইবে তখন তাহাকে দমদমায় ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে বলিবেন। এত রাত্রে এক-গা গয়না নিয়া শুধু দারোয়ানের সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে বাড়ি ফিরিবার সাহস কাকিমার নাই। নগেনের মা ওদিকের ঘরে জ্বর হইয়া শুইয়া আছেন, ও ঘরেও কাকিমা আর ঢুকিতে চান না।

নগেনকে বিমল আবিষ্কার করিল তাহার ঘরে।

কাকিমা সিঁড়ির গোড়ায় পাহারা দিচ্ছেন কেন ?

আমি পালাতে গেলে আটকাবেন।

কাকিমার কাছে তুমি আবার কী অপরাধ করলে নগেনদা ?

কত লোকের কাছে কত অপরাধ করেছি তার কী ঠিক আছে ? বোধ হয় দমদমা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

অন্যায়, বলিয়া বিমল হাসিল। তারপর নগেনকে বিশেষ অনুগহ করিবার মতো করিয়া বলিল, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবখন নগেনদা।

তুমি যাবে ? বাঁচালে ভাই। শরীরটা এত খারাপ লাগছে !

শরীর খারাপ না লাগিলে নগেন বিমলকে কষ্ট দিত না।

তারপর দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। বিমলকে আজ নগেনের কয়েকটা কথা বলিবার আছে। পরশু যদি সে চলিয়া যায়, প্রমীলাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। সে খবর পাঠাইয়াছে এ ভাবে নয়, আপনা হইতে খবর পৌঁছিয়াছে এইভাবে।

জানিস মিলি, নগেনদা পরশু লখনৌ যাবে।

পরশু ?

হ্যাঁ। পরশু কমলবাবুরা যাবেন, ওঁদের সঙ্গে।

কমলবাবুরা কে কে যাবে দাদা ?

সবাই যাবে।

লাবণ্য ?

লাবণ্যও যাবে। আমার কী মনে হয় জানিস? লাবণ্যর জন্যই নগেনদা বলা নেই, কওয়া নেই লখনৌ ছুটছে তিন দিনের নোটিশে। নগেনদার মতো লোক ও রকম ফাজিল মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে ছুটেছে, এটা ভারী আশ্চর্য না ?

হ্যাঁ।

তোর কী হল বল তো ?

কী আবার হবে ?.... আচ্ছা দাদা নগেনবাবু আপনা থেকে এ সব বললে ?

কীসব বললে ?

এই লখনৌ যাওয়ার কথাটথা ? লাবণ্যদের সঙ্গে ?

তাই আবার কেউ বলে নাকি ? আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে সব কথা বার করে নিলাম—নইলে নগেনদা কিছুই বলত না।

ভাইবোনের মধ্যে এমনি একটা কথোপকথন আজ অথবা কাল হওয়া চাই। প্রমীলার মুখখানা নগেন কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু কোনো কল্পনার উপরেই তাহার শ্রদ্ধা নাই।

জানালার বাহিরে একটা পামগাছ ভূতের মতো দাঁড়াইয়া আছে, দিনের আলোয় ওর সবুজ পাতাগুলি দেখিলে হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে ইচ্ছা হয়। এখন যদি আকাশ হইতে একটা বজ্র খসিয়া পড়ে আর সে বজ্রের আঘাতে ওই তরুটি নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকে নগেন তাহা কল্পনা করিতে পারিবে, কিন্তু সে কল্পনার উপরেও তার কোনো শ্রদ্ধা থাকিবে না। তার কল্পনা যেন নিজস্ব কিছু নয়।

গাছটার দিকে নগেন তাকাইল না পর্যন্ত, চাকরি-টাকরিতে তোমার বোধ হয় লোভ নেই বিমল ?

আমার সম্বন্ধে তোমাব এমন খারাপ ধারণা হল কী কবে ?

লোভ থাকলে লোভেব জন্য মানুষ চেষ্টা করে। সে সব লক্ষণ তোমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিমল জানে নগেন তাহাকে বকিবে না, সমালোচনাও করিবে না। তবু সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বলিল, কী যে বল নগেনদা! চাকরিব চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে মুখে রক্ত উঠে গেল। দিনরাত ওই তো ধ্যান করি।

নগেন হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বাস হয় না, তা হলে হেডউডের চিঠির জন্য আমায় তাগিদ দিতে।

বিমল বোকা নয়, সুপারিশপত্রেব জন্য নগেনকে তাগিদ দিতে সে ভুলিয়া যায় নাই। ম্যাকনিলের আপিসের চাকরিটা এত ভালো চাকরি, যে সেটি পাইবার ভরসা সে রাখে না। এই জন্যই চুপচাপ ছিল। কিন্তু নগেনের কাছে এ কৈফিয়ত দিতে দেওয়া যায় না। তার সুপাবিশে ফল হইবার ভরসা সে রাখে না, এ কথা শুনিলে নগেন একেবারেই খুশি হইবে না।

লজ্জার ভান করিয়া সে বলিল, ভুলে গিয়েছিলাম নগেনদা।

কবি আর কাকে বলে! টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া নগেন একখানা খামে মোড়া পত্র বাহির করিল। বিমলের হাতে দিয়ে বলল, শুধু চিঠিতে ফল হবে কী না কে জানে ! নিজে গিয়ে বলে আসতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা হত। কিন্তু সেই যে বুধবার এসেই চলে গেলে তারপর সাতদিন আব তোমার টিকিটি দেখতে পেলাম না, আজ সকালে এলেও হত, দুপুরে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম।

কাল দুপুরেই ?

পরশু চলে যাব, কাল আমার সময় কোথায় ? কোর্টে কাল তিনটে মোকদ্দমা ঝুলছে।

শেষ কথাটা মিথ্যা নয়, ভুল। কোর্টে মকদ্দমা কাল একটিমাত্র আছে এবং সে জন্য নগেনের কোর্টে যাওয়ার দরকার হইবে না। নগেন মিথ্যাবাদী নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে সে এ রকম ভুল কথা বলে।

বিমল শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

পরশু চলে যাবে মানে ? সাতাশে তোমার যাওয়ার কথা ছিল।

নগেন জানালার কাছে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, সে প্ল্যান বদলে গেছে।

তখন বিমল প্রশ্ন শুরু করিল। নগেন অর্ধ-অনিচ্ছার সঙ্গে তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। পরশু যাওয়াই সুবিধা ? কীসে ?.....একা যাইতে হইবে না ? একা যাইতে হইবে না মানে ? সঙ্গী আবার জুটিল কে ? সজনীবাবু ? সজনীবাবু ভারী সঙ্গী ! বোবার যদি বা শত্রু থাকে সজনীবাবুর নাই, ওর সঙ্গে যাওয়াটা সুবিধা নয়, শাস্তি। কমলবাবু ? কমলবাবু এখন লখনৌ যাইবেন কেন ? লখনৌ তার কী দরকার ? সপরিবারেই ? তার মানে, লাবণ্যও যাইবে নাকি ? ওঃ !

বিমল হাসিল।

ওই জন্য প্ল্যান বদলালে ? মিলি শুনলে হাসবে।

ওকে না বললে হাসবে না ! বলিয়া নগেন তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল। বলিল, এখানে খেয়ে নেবে ?

বিমল বলিল, কাকিমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে যে। অত রাত্রে আর এখানে আসব না নগেনদা, বাড়ি চলে যাব।

বাসের পয়সা এনেছ তো ? বিশ্বাস নেই তোমাকে, ভুলো মন !

বিমল সহজভাবেই বলিল, পকেটে চারটি পয়সা আছে। আমায় পাঁচটা টাকা ধার দিতে হবে নগেনদা।

নগেন আবার ড্রয়ার খুলিল। দশ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া বিমলের হাতে দিয়া বলিল, পাঁচ টাকা নেই। দশ টাকাই নাও। চাকরি হলে শোধ দিয়ো।

নগেনের অগোচরে বিমল একবার সন্তর্পণে নোটের প্রান্ত ঘামে ভেজা আঙুল দিয়া ঘষিয়া দেখিল। নগেন একবার ভুল করিয়া তাহাকে একখানার বদলে দুখানা নোট দিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনে নগেন যে ইচ্ছা করিয়া ছোটোবড়ো অনেক ভুল করে সেটুকু অনুমান করার সাহস বিমলের কোনোদিন ছিল না। নগেনকে সে বোঝে না, সে তার কাছে অনেকটা রহস্যময়। নগেন কথা কয়, হাসে, শিস দেয়, পরিহাস করে এবং পরিহাস বোঝে, নিজের বিশেষ পছন্দ-অপছন্দের সংস্কার রাখে। মানুষটা সাধারণ। নাটকীয় নয়। তবু সে কী যেন অতিরিক্ত কিছু, যার জন্য তার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দুর্বোধ্য ধারণা জন্মিয়া যায়।

•

সমস্ত পথ কাকিমার বকুনির কামাই নাই। তিনিও কবিতা লেখেন।

সত্যি লেখেন কাকিমা ?

কাকিমা বিনয় করিয়া বলিলেন, ভালো কী আর লিখতে পারি বাবা ? আমরা হলেম সেকেলে ধরনের লোক। কবিতা লিখতে ছেলেবেলা থেকে কে আর শেখালে বল ?

কবিতা লেখা যে লেখাপড়া শেখার মতো ছেলেবেলা হইতে কেহ শিখাইতে পারে বিমলের সে জ্ঞান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার বদলে কবিতা লিখিতে শিখিতেন। বোধ করি সেই জন্যই তিনি আজ অত বড়ো কবি। ছেলেবেলা কবিতা লেখা না শিখিয়া তার ভবিষ্যৎটা মাটি হইয়া গিয়াছে।

আপনার কবিতা পড়তে দেবেন তো কাকিমা ?

কাকিমা সলজ্জে বলিলেন, না না, সে পড়বার মতো কবিতা নয় বাবা। যা মনে আসে লিখে যাই, হিজিবিজি—

যা মনে আসে তাই লিখিয়া ফেলিলে যে কবিতা হয় না, এ জ্ঞান কাকিমার আছে। বস্তুত এই জ্ঞানটাই কবিতা লেখার সব চেয়ে বড়ো মূলধন। যত অঙ্ক-কষা শিখিলে বি এসসি পাস করা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি খাটিয়া কবিতা লিখিতে হয়, না শিখিলে কবিতা লেখা যায় না। আজ দুই বছর এই নিয়া বিমলের মন খারাপ হইয়া আছে। মনে যার কবিতা আছে সে কবি নয়, এ কী ট্রাজেডি জীবনে ! ও চুন সুরকির স্তূপ থাকা-না-থাকা সমান—ওর নাম বাড়ি নয়, পরের মন ওতে বাস করিবে না।

বয়স কী ছাই এমনি করিয়া বাড়ে !

এমনিভাবে তাহারা দমদমায় পৌঁছিল। কাকিমাকে বাড়ি পৌঁছিয়া দেওয়াব মধ্যে যে এতখানি নাটক দেখার সুযোগ ছিল, বিমল তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

বেড়ানো হল ?

সজনীর মুখ ভার।

তোমার হিংসা হচ্ছে নাকি ?

কাকিমা হাসি মুখখানি ভার করিলেন।

আমার আবার হিংসা কীসের ! তোমার বেড়ানো হল কি না তাই বল ।

কারও অসুখ করলে দেখতে যাওয়াকে বেড়ানো বলে না।

আমার অসুখ করলে কজন দেখতে আসে।

তোমার অসুখ তো লেগেই আছে বারোমাস, তার আবার দেখতে আসবে কী !

সজনী খানিকক্ষণের জন্য চুপ করিল। তারপব কহিল, আমি আজ খাব না।

বিমল সাশ্চর্যে কহিল, কাকা খাবাবের ওপবেও রাগ কবেন নাকি ?

কাকিমা বলিলেন, করেন। খাবারেব ওপবেও ওঁর রাগটা একটু বেশি। খাবে কী? ক্ষমতা থাকলে তো খাবে? যাবার সময় দেখে গেছি ওই ইজিচেযাবে পড়ে আছে চিত হয়ে, এখনও দেখছি তাই। হাতে পায়ে ঝিঁঝিও ধবে না, ভগবান !

বাড়ি ফেরার পথে বিমল বাবকয়েক মাথা চুলকাইল। কাকিমা আর সজনীর সম্বন্ধে তার অন্যবকম ধারণা ছিল। কাকিমা ভালো মানুষ, সজনী নার্ভাস। ওরা আবার ঝগড়া করিতে পাবে নাকি ?

ট্রামে অধরের সঙ্গে দেখা। সেই যে শান্তা, বাতায়ন পথে বিমল যাকে ভালোবাসিয়াছে, অধর তাব স্বামী।

লোকটার প্রকৃতি ভয়ানক গম্ভীব। হাসিলে তাহাকে ভারী সুন্দর দেখায়, কিন্তু হাসিবার প্রক্রিয়াটা সে আয়ত্ত কবিতে পারে নাই বলিয়াই অনেকে সন্দেহ কবে। মাঝে মাঝে সে মদ খায়, কিন্তু নেশা হয় না, এমনই সে কঠিন লোক।

বিমল ইহাকে ভয় কবে। স্বল্প পরিমাণ শক্তি নিয়া সে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, এখনও তাহার মধ্যে এতখানি শৈশব আছে যে, তাহা আজও তাহার চরিত্রকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে, সে স্নেহ কবে, স্নেহ চায, আজও তার দারুণ অভিমান। কিন্তু অধর যেন জীবন-যুদ্ধের জন্য বিশেষ করিয়া সৃষ্টি-করা যোদ্ধা। আঘাত সহিবাব বর্ম আছে, আঘাত করিবার অস্ত্র আছে, এবং ফাঁকতালে বিজয়লক্ষ্মীকে টানিয়া তুলিবার সাহসও আছে। লোকটা যে বড়ো লোক হয় নাই কেন, ভাবিযা বিমল অবাক হইয়া যায়।

বিমলের অভিজ্ঞতায় অধর আজ প্রথম রসিকতা করিল, এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরছেন ?

অধর ইচ্ছা করিয়াই বিমলকে তুমি বলে না। এবং সেটা বিমল বুঝিতে পারে। বিমল বলিল, আপনার মতো আমিও একটা নতুনত্ব করছি এই আর কী !

অধরের হাসিহীন মুখ গম্ভীর হইল।

আমার অনুকরণ করছেন কবে থেকে ?

আজই প্রথম।

এ যে রীতিমতো সংগ্রাম ! সজনী ও কাকিমার কলহের চেয়ে সূক্ষ্ম হইলেও ঢের বেশি রূঢ়, ঢের বেশি তীব্র! বিমল আশ্চর্য হইয়া গেল। আপনা হইতে এমন ব্যাপারও যে ঘটিয়া যায় তাহার এ ধারণা ছিল না।

অধর আর কিছু বলিল না। ভাঁজ করা খবরের কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মুখে তাহার ভাবপরিবর্তনের ইঙ্গিতও নাই। বিমল বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা আলো ঝলমল দোকানের নাম পড়িয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, অধর হয়তো ওই দোকানটারই বিজ্ঞাপন পড়িতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

খানিক পরে ভিতরে চোখ আনিতেই সে দেখিল অধর একাগ্র দৃষ্টিতে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অধর চকিতে খবরের কাগজে দৃষ্টি নামাইয়া নিল। এমনভাবে নিল যে বিমলেব বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রথম দিন শান্তাকে চুরি করিয়া দেখিতে দেখিতে চোখাচোখি হওয়ামাত্র এমনই চকিতে সে দৃষ্টি সরাইয়া নিয়াছিল।

বিমলের মনে হইল, শান্তার স্বামীর সর্বাপেক্ষা গোপন একটা পরিচয় সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। ওর মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে, একটা অসামঞ্জস্য আছে। আজ অতর্কিতে ধরা পড়িয়া গেল। বর্ম ভেদ করিয়া নেপথ্যের এই দুর্বোধ অসংযমকে জীবনে হয়তো আর আবিষ্কার করা যাইবে না, কিন্তু ইহার অস্তিত্বে কখনও সন্দেহ করাও আর চলিবে না। কাল হোক, পরশু হোক আবার যখন ইহার সঙ্গে দেখা হইবে, মনে পড়িয়া যাইবে যে এ লোকটা খাঁটি লোহা দিয়া তৈরি নয়।

অনেক মাথা ঘামাইয়া বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের ঠাকুব পালিয়েছিল, ঠাকুর পেয়েছেন?

জীবনে যেন এই প্রথম বিমলেব মুখের দিকে চাহিল এমনই নির্বিকার দৃষ্টি চোখে আনিয়া অধর বলিল, ঠাকুর পালিয়েছিল দশ-বারো দিন আগে, এতদিনেও একটা ঠাকুর পাব না?

অর্থাৎ, তুমি একটা গাধার মতো প্রশ্ন করিয়াছ।

বিমল আহত লজ্জার অভিনয় করিয়া নার্ভাস হইয়া বলিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

খবরের কাগজে চোখ নামাইয়া অধর বলিল, হ্যাঁ, ঠাকুর পেয়েছি। একদিনের বেশি শান্তাকে কষ্ট করে রাঁধতে হয়নি।

এবার আর বিমলকে নার্ভাস হওয়ার অভিনয় করিতে হইল না। অধরের যে দুর্বলতাব পরিচয়ই সে আবিষ্কার করিয়া থাক, অধর ভিন্ন এ কথা আর কেউ বলিতে পারিত না। এ কথার জবাব আছে, কিন্তু অধরের চেয়ে ভয়ানক লোক না হইলে সে কথা অধবের সামনে মুখ দিয়া বাহির করার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

বিমল মনে মনে বলিতে লাগিল, আপনার স্ত্রী চমৎকার রান্না করেন। সেদিনের নেমন্তন্নেব কথা অনেক কাল মনে থাকবে। মাংস যা হয়েছিল, অমৃত!

বিমলের দিকে চাহিয়া অধর বলিল, ঠাট্টা করছেন?

মনে মনেও বিমল এবার আর কিছু বলিতে পারিল না।

অথচ প্রমীলা অধরকে গ্রাহ্য করে না, বিমলের চেয়ে সে তো আরও কত বেশি ভীরু। বরং প্রমীলা উপস্থিত থাকিলে অধরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসে। মনে হয়, গাঢ় অন্ধকার হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসিয়া আলো তার চোখে সহিতেছে না।

প্রমীলা বলে, অধরবাবু, আপনার মুখে একটা মিষ্টি কথা আজ পর্যন্ত শুনলাম না। কথা বললেই মনে হয় ধমকাচ্ছেন। আপনার ধমক গ্রাহ্য করে কে?

কথাটা সে পরিহাস করিয়াই বলে, শান্তার সঙ্গে পাতানো সম্পর্কের হিসাবে অধরকে ঠাট্টা করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু বিমলের মনে হয় সুস্পষ্ট পরিহাসটির মধ্যে এমন একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে যাহা তীক্ষ্ণ ও উদ্ধত। অধর যেন সেটুকু বুঝিতে পারে, কিন্তু বুঝিতে পারার কোনো লক্ষণ দেখায় না, এইমাত্র।

প্রমীলা আরও অনেক কিছু বলে। বলে, ও সব আপনি বুঝবেন না, সব লোকে যদি সব জিনিস বুঝতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না।

এমন করিয়া সে কেন বলে কে জানে, অধরের উপর তার রাগের কারণটা দুর্জ্ঞেয়। বোধ হয় শান্তা তাহাকে কিছু বলিয়াছে। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে পরের কাছে কিছু বলিবার মেয়ে শান্তা নয়। তবে হয়তো প্রমীলা নিজেই কিছু অনুমান করিযাছে। কিন্তু ও বিষয়ে বিমলের জ্ঞান খুব কম। জ্ঞানসঞ্চয়ের ইচ্ছাও তার নাই। যাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় করে প্রমীলা তাকে ওভাবে তুচ্ছ করিয়া দেয় কী করিয়া বুঝিতে চাওয়াব মধ্যেই যেন নিজের বেশি রকম দুর্বলতা আছে, এমনিভাবে বিমল কৌতূহলটা চাপিয়া রাখে।

অধরের পিঠের লাঠিটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সেটি তুলিয়া অধবের দুই হাঁটুর ফাঁকে ঠেস দিয়া রাখিয়া বিমল আবার বাহিরের দিকে চাহিয়া বহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তার কাছে অধর বিমলের খুব প্রশংসা করে। বলে, ছেলেটি ভালো। একটু উদ্ধত, কিন্তু এ বযসে মিনমিনে হওয়ার চেয়ে একটু তেজ থাকা মন্দ নয়।

শান্তা এ বিষয় কোনো মন্তব্য করে না।

অধর আরও বলে : ওব সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। অনেক ধারণা বদলে দেয়। আমি হেন লোক, ওব সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করে আমার পর্যন্ত মনে হয় কবিতা লেখাটা নেহাত বাজে কাজ নয়।

বলিয়া সে জোর করিয়া হাসে। এমন উৎকট হাসিই সে হাসে যে মনে হয় বিমল যে কবি আর সে যে কবি নয়, এই কথাটা শুধু নিজের হাসি দিয়াই সে প্রমাণ করিতে চায় ; কথা প্রসঙ্গে যে—বিমল শান্তার মনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইযাছে তার সঙ্গে শান্তা তাহার তুলনা করুক এ ইচ্ছা সে যেন রাখে। বিমলের শান্ত হাসিটা অধরের মনে আছে। ও হাসির সঙ্গে শান্তার পরিচয় যে আরও ঘনিষ্ঠ এও সে জানে।

আজ সদ্য সদ্য ট্রামে বিমলের সঙ্গে কলহ করিয়া আসিয়া সে একান্ত নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। মুখে তাহার বিরক্তির রেখাটি নাই। শোবার ঘরে ঢুকিয়া শান্তার চমকও সে নির্বিকারভাবেই চাহিয়া দেখিল।

শান্তা খাতায নিবিষ্টচিত্তে লিখিতেছিল।

কী লিখছ ? কবিতা ?

না।

ধোপার হিসাব ?

না। এমনি হিজিবিজি কাটছি।

ওটা কবিতা লেখার প্রথম অবস্থা। হিজিবিজি কাটা দেখতে চাই না, কবিতা লিখতে আরম্ভ করলে দেখিয়ো। দেখাবে তো ? জামা খুলিয়া সে দেয়ালে বসানো কাঠের আঙ্গুলে ঝুলাইয়া দিল। লোমশ বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কথা বলছ না যে ? বোবা হয়ে গেলে নাকি ? না, ভাব লেগেছে ?

কী বলব ?

কবিতা লিখলে আমায় দেখাবে ?

কবিতা লিখব কেন ?

লিখবে না ? অধর আশ্চর্য হইয়া গেল। তারপর হাসিয়া বলিল, সেই ভালো। লিখো না। ও রোগের চিকিৎসা নেই।

শান্তার পাশেই সে বসিল। ডান পা-টি নাচাইতে আরম্ভ করিয়া বলিল, তার চেয়ে বরং নতুন নতুন রান্না শিখো, বেনামি খাবার কোরো, সুনাম হবে। আজ একজনের কাছে তোমার যা প্রশংসা করে এলাম !

অধর নিজে নিজেই খুশি হইয়া উঠিল। খপ করিয়া শান্তার একটি হাত টানিয়া নিয়া উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া বলিল, অমৃত তৈরি করার মতোই হাত বটে। তোমার সর্বাঙ্গ যদি তোমাব হাত দুটির মতো হত শান্তা তোমাকে পাহারা দিতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত !

অধর মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে মদ খায়। কিন্তু শান্তা জানে তাহাতে অধরেব দেহমনের জড়তাই শুধু কাটিয়া যায়, কখনও নেশা হয় না। অধরের আজ এমন চপলতা কেন ? সঙ্গত নয়, তবু শান্তার ভয় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সে কথা বলে নাই। কনে বউও সে নয় যে চুপ কবিয়া স্বামীর আদর ভোগ করিবে।

একটু হাসিয়া এবার শান্তাকে বলিতে হইল, আজ যে তুমি এত কথা বলছ ?

কখন বললাম ?

এই তো বললে। এত কথা বলছ কেন জিজ্ঞেস করলে অন্যদিন তুমি জবাবই দিতে না।

অধর সহসা কথা বলিল না। প্রথমে হাসি এবং তারপর পা নাচানো বন্ধ করিল। তারপর শান্তার কাঁধে হাত রাখিল। তার মুখখানা বিষণ্ণ হইয়াছে।

কীসের ভূমিকা ? শান্তা বিবর্ণ হইয়া গেল।

কথার জবাব না দিলে তোমার রাগ হয় নাকি ?

কয়েক মুহূর্তেই শান্তা অভিভূতা হইয়া গিয়াছিল। এই লোকটির উগ্র ব্যক্তিত্ব যখন এমন মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া এত নিকটস্থ হয়, তখন মাথা ঠিক রাখা শক্ত। মনে হয়, পৃথিবীব আর সব মানুষ এর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কোনোমতে ঘাড় নাড়িয়া শান্তা বলিল, না; রাগ কেন হবে ?

অধর আহত হইয়া বলিল, রাগ হয় না ? আমি কথার জবাব না দিলে তোমাব রাগ হয় না ?

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল, রাগ হয় না—দুঃখ হয়।

অধর তাহাকে কাছে টানিয়া নিল। শান্তার কাছে এখনই সে যেন তাব সমস্ত অনাদর অবহেলার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে গিয়া ভগ্নকণ্ঠে চুপ করিয়া যাইবে। তার মুখ দেখিয়া শান্তার বুকের ভিতর টিপটিপ করিতে লাগিল।

যদি সত্যই দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা চায় ? যদি বলে, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, আমি কী শান্তা ? আর আমি অমন করব না। আমায় তুমি ক্ষমা কর। সে তখন কী কবিবে ? অনুতপ্ত স্বামীকে কী বলিবে ?

অধর হঠাৎ কিছু বলিল না। অনেক কিছু বলিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তাহার অভিনয় মাথা ছাড়িয়া হৃদয়ে স্থানান্তরিত হইয়া যাওয়ায় সে মুখ খুলিতে পারিল না।

এ ভয় অধরের ছিল। হঠাৎ একদিন হ্যাঁচকা টান দিয়া কাছে টানিতে গেলে মানুষ আরও দূরে পালায় বটে, অন্য আকর্ষণটির আরও কাছে সরিয়া যায় বটে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে ওভাবে টানিতে যাওয়াটা মাঝে মাঝে বিপজ্জনক হইয়াও দাঁড়ায়। শান্তা এত ভীরু, এত ক্ষীণ তাহার গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যে, ওর কাছাকাছি আসিয়া ওকে ভয় দেখানো যেমন কঠিন, হঠাৎ বন্যার মতো মমতা ঢালিয়া দিয়া ওর নেওয়ার শক্তিটুকুকে পঙ্গু করাও তেমনি কঠিন। প্রথম মানুষ খুন করিতে যাওয়ার মতো কোথায় যেন বাধিয়া যায়। মনে হয়, আজ থাক, আর একদিন দেখা যাইবে। তাড়াতাড়ির কী আছে ?

কিন্তু থামিবার উপায় ছিল না, কারণ তার কোনো মানে হয় না। অধর বারকয়েক শান্তার কপালে, মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, আচ্ছা, আর কখনও তোমায় দুঃখ দেব না।

এ কথা বলা চলে। আজ রাত্রিটা কাটিলে এ কথার আর কোনো মানে থাকিবে না।

রাত্রে শান্তা চোখের পাতা বুজিতে পারিল না। রাত্রি একটা পর্যন্ত বিমলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে বোঝা গিয়াছিল, বন্ধ জানালার একটা ফাঁক দিয়া বিমলের আলো সূক্ষ্ম রেখার মতো এ ঘরে প্রবেশ করে, শান্তার মনে হয় আলোকরেখার অন্যপ্রান্তে বিমল চোখ রাখিয়া বসিয়া আছে। প্রতিরাত্রেই মনে হয়। বিমল যতক্ষণ আলো জ্বালাইয়া রাখে শান্তা ঘুমাইতে পারে না। একদিন কাগজ দিয়া সে জানালার ফুটাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই।

অধর বলিয়াছিল, কী করছ?

বাইরে যাব।

জানলা দিয়ে বাইরে যেতে পারবে না। ওতে শিক বসানো আছে।

এটা দরজা নয়? ওমা, তাই তো! ঘুমের চোখে বে[illegible] এসেছি।

আলো জ্বাললেই হয়।... যেদিন ঘুম আসবে না বাইরে [illegible] বসে থেকো। আমাকে সারাদিন খাটতে হয়।

একটু পরে . না খাটলে, হাওয়া দিয়ে পেট ভরাতে হবে, বুঝলে? সে ক্ষমতা থাকলেও বরং বোঝা যেত।

আজ বিমলের ঘরে আলো নিবিয়া গেলেও শান্তা ঘুমাইতে পারিল না। কিছুদিন হইতে তার মনে হইতেছিল তারই চারিদিকে কী যেন একটা চক্রান্ত গড়িয়া উঠিতেছে, জীবনে এমন কতগুলি ছোটো বড়ো ঘটনা জমা হইয়াছে, যার মানে বোঝা যায় না। বিমলের আকর্ষণটা সে খানিক খানিক বুঝিতে পারে এবং বিশ্বাস করে ও তার নিজের রচনা, কিন্তু বিমলের দিকে তাহাকে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিতেছে কীসে? যেখানে সে থামিতে চাহিয়াছিল সেখানে থামিতে পারে নাই, যেখানে আসিলে ভয়ের কথা সেখানে আগাইয়া আসিয়াছে,—বিপদের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে, যে কোনো সাংঘাতিক সম্ভাবনার মধ্যে। বিমলের চোখের ভাষা যে কোনোদিন মুখর হইয়া উঠিতে পারে। কাল—

কালের ব্যাপারটা সত্যই ভালো নয়—যদিও তখন খুব ভালো লাগিয়াছিল। জানেন, এই কালি আর আমার বুকের রক্তে কোনো তফাত নেই। এই দিয়ে আমি কবিতা লিখি—বলিয়া কলমের গোড়ায় কালি নিয়া বিমল তাহার হাতের তালুতে মাখাইয়া দিয়াছিল।

হাতের তালুতে কালি মাখাইতে গিয়ে বিমল এত জোরে তাহার হাত ধরিয়াছিল যে আর কেহ সেভাবে ধরিলে শান্তার ব্যথা লাগিত।

যদিও পরিহাস নয়, তবু সেটুকু পরিহাসের পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া হাত ধুইয়া দেওয়ার মধ্যে পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না। সে কোনো প্রতিবাদ কানে তুলিল না, তার শিহরিত লজ্জা অগ্রাহ্য করিল, রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া নিজের চোখ দুটিকে স্পষ্টই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। হাত যে ছিনাইয়া নিতে পারে না, তার হাত নিয়া কী অমন খেলা খেলিতে হয়? প্রমীলা উপস্থিত না থাকিলে দুঃখে, অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিত। হয়তো কাঁদিত না। কিন্তু সত্যই তার কান্না পাইয়াছিল।

বিমলের দস্যুতাটুকু খুবই তুচ্ছ, কিন্তু কদিন সে এমন দস্যুতাতে তুষ্ট থাকিবে? হাতে কালি ঢালার ছলনার আড়ালে সে হাত ধরিতে চায় ধরুক, শান্তা বারণ করিবে না, বারণ করিতে চাহেও না। কিন্তু কালি ঢালিয়াই সে যখন হাত ধরিতে যাইবে?

ওদিকের বিছানায় অধর নাক ডাকাইতেছে। এদিকের বিছানা ছাড়িয়া শান্তা উঠিল। বাস্তবিক তার শরীরটাই জ্বালা করিতেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া সে ছাদে চলিয়া গেল। আজ তার ভূতের ভয় কমিয়া গিয়াছে।

বিমলকে সে সামলাইতে পারিত, দুটি বাতায়নের সীমা বজায় রাখিতে না পারিলেও হাত নিয়া খেলা করিবার আগে হাতে কালি ঢালার ছলনা কোনোদিন ঘুচিতে দিত না। কিন্তু যে অদৃশ্য শত্রু তাহাকে বিমলের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে তার সঙ্গে রফা করিবে কেমন করিয়া! কতদিন সে বিমলের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে না জানিয়া। ইহার সঙ্গে লড়াই চলে না।

একেবারে খেলা ছাড়িয়া দিবে কী না এত রাত্রে ছাদে দাঁড়াইয়া শান্তা তাহাই ভাবিতে লাগিল। আর বিছানায় মটকা মারিয়া পড়িয়া থাকিয়া অধর ভাবিতে লাগিল, রাতদুপুরে ছাদে যাইতে শিখিয়াছে, ঘরে দম আটকায়। আর বেশি দেবি নাই।

সোজা কথায়, অধরের মতো মানুষও ধৈর্য হারাইতেছিল। পাপের নেশা হইয়াছে অথচ পাপ করিতেছে না এ ব্যাপার তাহার ধারণাতীত। প্রেমের বিকাশ হইতেই যে এত সময় লাগে এটা তাব কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য ঠেকিতেছিল। কল্পনার, মাধুর্যের, মন দিয়া মন চেনাব আনন্দের বাধা যে আব সব বাধার চেয়ে বড়ো এ অভিজ্ঞতা অধরের ছিল না। ফুলের দাম যার কাছে নাই, তার কাছে পুষ্পমাল্যের সুতাটি অবশ্যই লোহার শিকলের চেয়ে শক্ত নয়।

তাছাড়া, ফুল যে একদিনে শুকায় এ সত্যটাও পৃথিবীর অনেকেব কাছে বড়ো। যেন, ফুল শুকাইলে সেটা আর কিছু হইয়া যায়!

সকালে ঝিকে দিয়া অধর বিমলেব কাছে শান্তার চায়েব নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিল—প্রমীলাও যেন অবশ্য আসে।

রাত-জাগা মাথা-ধরা নিয়া শান্তা চুপ করিয়া রহিল।

আসিল বিমল একা, প্রমীলা রান্না করিতেছে।

অধর বলিল, আসুন, আসুন। সকালে উঠে কবি-মুখ দর্শন হল ; দিনটা ভালো যাবে।

বিমল ভাবিয়া আসিয়াছিল, অধর-বাড়ি নাই। অধর বাড়ি থাকিতেই শান্তা তাহাকে চা-পানের জন্য ডাকিয়া পাঠাইবে এমন আশঙ্কা সে করে নাই। অধরের অভ্যর্থনায় একমুহূর্তে তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না।

শান্তা আজও লালপাড় শাড়ি পরিয়াছে। পাড়েব রং এত ঘন যে মাথার কাপড়ে প্রতিফলিত আলোয় তাহার মুখে লালিমার আভা পড়িযাছে।

বিমল নিঃশব্দে বসিল।

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, মিলি এলো না?

মিলি রাঁধছে।

অধর বলিল, বোন রাঁধছে, ভাই তাই একাই এলেন?

নিমন্ত্রিতের প্রতি এ কেমন মন্তব্য? সকালে কবি-মুখ দেখার কথাটা ঠাট্টা, কিন্তু এটা? শান্তা ভীত হইয়া উঠিল। কাল পর্যন্ত অধর বিমলের কত প্রশংসা করিয়াছে, আজ সে সেই প্রশংসিত ব্যক্তিটিকে সামনা-সামনি অপমান করিবে নাকি? বিমলের মুখ দেখিয়া শান্তার বুক মমতায় ভরিয়া গেল। ও জবাব দিতেও পারিবে না, অপমান সহিতেও পারিবে না। এমন কিছু বলিবে অথবা করিবে যে হাসিয়া উঠিয়া অধর তাহাকে অপদস্থের একশেষ করিয়া ছাড়িবে। এমন অনুচিত, এমন অবান্তর এবং ধরিতে গেলে এমন হাস্যকর কথা যে বলিতে পারে তার সঙ্গে বিমল পারিয়া উঠিবে কেন?

অধর একাগ্র দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল—ওর বুকে সে মমতার চাষ করিয়াছে, নিজের জন্য নয় পরের জন্য। অধরের চোখে একবার পলক পড়িল না। নদীর পাশে আগ্নেয়গিরির ছবি সে দেখিয়াছে, অমনই একটি স্থানে শেষ জীবনে তাহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে ; শান্তাকে স্মরণ করিয়া একবার জলে ডুবিবে, প্রমীলাকে স্মরণ করিয়া একবার আগুনে পুড়িবে,—জীবনের সেই হইবে জপ আর তপ। কিন্তু এখন আত্মসংবরণ করিতেই মাঝে মাঝে যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। বিমল দারুণ অপমান বোধ করিয়াছিল। কিন্তু শান্তভাবেই সে বলিল, আমার আসা অন্যায় হয়ে গেছে।

অধর দুঃখিত হইয়া বলিল, রাগ করলেন ? আমি কিছু ভেবে কথাটা বলিনি। প্রমীলা বাঁধবে বইকী—নিশ্চয়ই রাঁধবে।

নিশ্চয় রাঁধবে মানে ?

রাঁধবে না ? অধর আশ্চর্য হইয়া গেল।

মুশকিল এই যে পাথরে কিল মারিলে হাতেই লাগে, পাথরের কিছু হয় না। অধর যে তাকে তুলার মতো ধুনিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিতে পারে বিমল তাহা জানিত—লড়াই বাঁধার আগেই সে হারিয়া আছে। উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার সামর্থ্যটুকু সংগ্রহ করিবার জন্যই সে কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিল।

অধর খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে এই প্রথম তুমি সম্বোধন করিয়া কথা কহিল।

সত্যি রাগ করেছ নাকি বিমল ? দ্যাখো দিকি ছেলেমানুষি ! পাতানো জামাইবাবু বলে কি আমার ঠাট্টারও খারাপ মানে করতে হয় ?

হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, না হয়, আর ঠাট্টা করবই না। হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিমলের বদলে শান্তাই এবার চলিয়া গেল। অধর তার চোখের কোণে জল দেখিয়াছে।

বিমল উঠিবার চেষ্টা করিল না, রাগের লক্ষণও দেখাইল না। চায়ের কাপটা তুলিয়া নিয়া ছোটো ছোটো দুটি চুমুক দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, নিজে নিজে কুস্তি করে হাঁপান কেন? নিজের সঙ্গে কুস্তি করে হাঁপাতে নেই, লোকের হাসি পায়।

অধর স্মিতমুখে বলিল, একজন কিন্তু কাঁদবার উপক্রম করেছিল।

কে ? উনি ? বিমল মাথা নাড়িল, হাসি চাপতে না পেরে পালিয়ে গেলেন। আমাকে ছেলেমানুষ বানাতে চেয়ে নিজে আপনি এমন ছেলেমানুষ বনেছেন যে বুঝতে পারলে আপনার হাসি আসত।

অধর বলিল, তা ঠিক। আমি ভারী বোকা। বুঝতে না পেরে চোরের হাতে আমি সর্বস্ব তুলে দিতে পারি। সে একটু হাসিল, একটু একটু করে কেউ যদি আমার সর্বস্ব চুরি করে, চেয়ে দেখেও বুঝতে পারি না কী ব্যাপার চলছে। সব চুরি হয়ে গেলে ছেলেমানুষের মতো—ছেলেমানুষের মতো কী করি বল তো ?

বিমল সভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অধর হার মানিয়াছে এবং নিরুপায়ের মতো তার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়াছে। এই কারণেই ইহাকে হারাইতে বিমলের ভয় করে, আগেই সে হার মানিয়া রাখে। হার মানিলেই ও শান্তাকে শিখণ্ডীর মতো সামনে ধরিয়া জিতিতে চাইবে।

বিমল চলিয়া গেলে উপরের ছোটো ঘরখানায় শান্তাকে আবিষ্কার করিয়া অধর প্রশ্ন করিল, আমায় অপমান করে উঠে এলে যে ?

শান্তা ডাল বাছিতেছিল। হঠাৎ অধরের পায়ে ধরিয়া তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আমায় মাপ করো। আর কক্‌খনো আমি এমন করব না।

অধর থতোমতো খাইয়া গেল। এও কি অভিনয় শিখিয়াছে ?

তবু, অবস্থাবিশেষে সমস্তই মানিয়া নিতে হয়। যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কেন ঘটিল বলিয়া আপশোশ করে বোকা। ঘটনা ঘটিবার পর অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে, তাহারই হিসাব করিয়া বুদ্ধিমানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

অধর তিনদিন অসুখের ছুতায় অফিস কামাই করিল। শান্তাকে কাজ কবিতে দিল না, চোখের আড়াল হইতে দিল না, হারানো ভালোবাসার মতো সর্বদা বুকে করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল।

সহসা সে অসাধারণ স্ত্রৈণ হইয়া পড়িল। সকালবেলাই বলে, এসো, গান শিখবে।

এখন ?

এসো, লক্ষ্মী।

শান্তাকে সে লক্ষ্মী বলে! লক্ষ্মী !

অধর ভালো গান জানে, প্রথম বয়সে যথেষ্ট সংগীতচর্চা করিযাছিল। মনে করিযা করিয়া শান্তাকে সে ভৈরবী শেখায়, মালকোষের নমুনা দেখায়, দরবারি কানাড়া যে মেয়েদের গলায় কেন মিষ্টি শোনায় না বুঝাইয়া দেয়। চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া শান্তার গলা চিরিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

তখন অধর বলে, এবার একটা বাংলা গান গাও।

শান্তা প্রাণপণে বহু পুরাতন বাংলা গান ধরে, অধর মন দিয়া শোনে। এ বাড়িতে হঠাৎ গানবাজনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া ও বাড়িতে প্রমীলা বিস্মিত হয়, বিমলের দুর্ভাবনার সীমা থাকে না।

দুপুরবেলা তাহারা দাবা খেলে। দাবা খেলায় শান্তা কম যায় না। মামাব সঙ্গে এ খেলা সে বহু খেলিয়াছে, চাল জানে। মন্ত্রী দিয়া অধরের রাজার সম্মুখস্থ গজকে চাপিয়া বাখিয়া গজের মুখে ঘোড়ার কিস্তি দিয়া সে ভুল চাল দেওযার ভান কবে এবং নিজের মন্ত্রী দিযা অধর তার ঘোড়াকে হত্যা করিলে কোথা হইতে একটা গজ টানিযা অধরের নৌকা তুলিয়া নেয়।

বলে, ফেরত নেবে ?

অধর মাথা নাড়ে— না।

তখন শান্তা বুঝিতে পারে নৌকা দেওয়া অধরের খেলামাত্র—দান। ঘোড়াব টোপটি সে ইচ্ছা করিয়াই গিলিয়াছে তবু সে আশায় আশায় বলে, সর্বনাশ ! তুমি ও বোড়েটা ঠেলে দিলেই গেছি।

অধর বোড়ে ঠেলিয়া দেয় না। মন্ত্রীকে অন্য ঘরে নিযা গিয়া বলে, বোড়ে ঠেললে কিছু হয না। এবার সামলাও দেখি ?

শান্তা আক্রমণ সামলায়, কান্নাও সামলায়। তার হাঁপ ধরিয়া গিয়াছে। দিবাবাত্রি এ ভাবে মানুষ সাইকলজির উপন্যাস রচনা করিতে পারে ? কিছুই সহজ নয়, সাধারণ নয়, প্রত্যেকটি কাজের গোপন অর্থ আছে, গোপন উদ্দেশ্য আছে। মুখের 'হাঁ' শুনিয়া মনের 'না'কে সে আর কত আবিষ্কার করিবে ? খেলার হারজিত নিয়া পর্যন্ত উত্তেজিত হইতে পারিবে না তাহাব এ কী শাস্তি !

বিমল এ রকম কবিত না। ইচ্ছা করিয়া তাকে জিতাইয়া দিলেও এমনভাবে দিত যে ইচ্ছা করিলে সে খুশিও হইতে পারিত আবার ইচ্ছা করিলে রাগ করিয়া দাবার ছক উলটাইয়া দিয়া বলিতে পারিত, চাইনে খেলিতে। একটা নৌকা দান করিতে অধর কত কায়দা করে ! হারিলে সে যেন কাঁদিবে। তাই কৌশলে অধর কান্না নিবারণ করিল।

স্বামীকে সহসা শান্তার দয়ার বৈজ্ঞানিকের মতো লাগিল। দয়া করার ভয়ানক ভয়ানক পন্থা যে আবিষ্কার করিয়াছে।

শান্তা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে, বিমলের সঙ্গে একদিন দাবা খেলিবে। জিতিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে বিমলকে দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিয়া।

বলিবে, সত্যি, ঠাট্টা নয়। আমাকে একবার ভদ্রলোকের মতো হারাতে দিন।

বিকালে অধর বলে, চলো বায়োস্কোপ যাই।

আজ ? আজ আমার মাথা ধরেছে।

চলো, লক্ষ্মী! আজ বায়োস্কোপ দেখে আসি, কাল থিয়েটার যাব।

শান্তা বায়োস্কোপ যাওয়ার জন্য কাপড় পরিতে পরিতে ভাবে, কাল থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া পরশু ও যদি বলে, চলো দার্জিলিং বেড়িয়ে আসি ? ফিরবার সময় অজন্তা হয়ে তিব্বত ঘুরে আসব ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নগেনের লখনৌ যাওয়ার খবরটা প্রমীলা এমনভাবে গ্রহণ করিল যে, বিমল ভাবনায় পড়িয়া গেল। লাবণ্যের কথা উল্লেখ করিয়া সে একটা হাসির কথা বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

শুধু বলিল, লাবণ্যকে শেষ পর্যন্ত নগেনদার পছন্দ হবে এটা তুই ভাবতে পেরেছিলি ?

প্রমীলা মাথা না নাড়িয়াই বলিল, না।

আমিও পারিনি।

যেন প্রমীলার না ভাবার চেয়ে তার না-ভাবাটাই বেশি বিস্ময়ের।

পাশের বাড়ির উঠানে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ আছে, উপরের অংশটা এ বাড়ি হইতে নজরে পড়ে। প্রমীলা সেদিকে চাহিয়াছিল। কারণ, বিমল তাহার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখিতেছে। বিমল বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিবে এ ভয় প্রমীলার নাই, তবু পুরামাত্রায় আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লাবণ্যদের সঙ্গে অসময়ে লখনৌ যাইতেছে শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিয়াছে এ কথা জানিতে পারিলে নগেন নিশ্চয় হাসিবে। ভাবিবে, ওরা সবাই সমান। নরনারীর সম্পর্কটা কেবলই অবস্থাগত করিয়া রাখিতে চায়। না, নগেন যদি একা লাবণ্যকে সঙ্গে নিয়া লখনৌ ঘুরিয়া আসে তাহাতেও তার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিবার অধিকার নাই।

অন্তত নগেনের সঙ্গে তাহার ও রকম কড়ারই হইয়াছে। দুমাস ধরিয়া সে যে আসা-যাওয়া কমাইয়াছে, গত একমাসের মধ্যে সে যে একবার খবর নেয় নাই তারপর এই যে সে একটা অকথ্য রকমের আধুনিক মেয়ের সঙ্গে বিদেশে চলিল—এ সমস্তই তুচ্ছ, এ নিয়া অভিমান চলিবে না।

বিপদের আর অন্ত নাই।

খানিক ঘুরিয়া আসিয়া বিমল বলিল, এমনও তো হতে পারে যে, লাবণ্যই নগেনদার পিছনে ছুটছে।

বিমল হাসিয়া বলিল, তোকে কিছু করতে বলছি না। তারপর আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, করলেই বা দোষ কী ? নগেনদা বন্ধুমানুষ, ওকে বাঁচানো পাপ নয়।

প্রমীলা মাথা নাড়িয়া বলিল, ও সব মরণ যারা চায় তাদের কেউ বাঁচাতে পারে না দাদা।

নগেনদা সে রকম নয়।

কী রকম নয় ?

বিমল খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্থানত্যাগ করার আগে সংক্ষেপে বলিয়া গেল, তুই বড়ো বেয়াদব।

পায়ের নীচের মাটির মধ্যে যে দেবী বাস করেন তার নাম ধরিত্রী। বড়ো সহিষ্ণু তিনি। প্রমীলা যে আজ প্রথম নয় আরও অনেকবার তার আলিঙ্গন কামনা করিয়াছে বিমল তাহা জানিত না।

একদা বিমল একটা আশা করিয়াছিল। নগেন তখন সর্বদা আসা-যাওয়া করিত এবং বেশ বোঝা যাইত প্রমীলাকে সে পছন্দ করে। প্রমীলার মনের ভাবটা বিমলও পরিষ্কার জানিতে পারে নাই, কিন্তু অনেক কিছু সন্দেহ করিবার অবকাশ প্রমীলা তাহাকে দিয়াছিল। তারপর নগেন যখন এ বাড়িতে আসা প্রায় ছাড়িয়া দিল এবং সে জন্য প্রমীলারও কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, তখন বিমল মনকে বুঝাইয়াছিল, কথাটা বাজে।

এতদিনের বাজে কথাটা আজ তাকে বিচলিত করিয়াছে।

নগেনের অবহেলা প্রমীলা গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। খোঁজখবর না নেওয়াটাও সব সময় অবহেলার পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রেমের ব্যাপারে কোন কাজের পিছনে কী কারণ আছে অনুমান করিবার সাহসও বিমলের নাই।

প্রমীলা রান্না করিতেছিল, বার কয়েক বিমল নিজের চোখে তাহাকে এবং তাহার কাজ করাটা দেখিয়া আসিল। কয়লার উনুন, ধোঁয়া হয় না, ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিবার উপায় প্রমীলার ছিল না, কিন্তু উনানে ডালের হাঁড়ি চাপাইয়া গালে হাত দিয়া পিঁড়িতে বসিযা থাকিবার সুযোগ ছিল, তবু বিমল তাহাকে একবার অন্যমনস্ক অবস্থায় আবিষ্কার করিতে পাবিল না। এমন কী সে আজ পাঁচুব কান পর্যন্ত মলিয়া দিল। কোনো মমতা বোধ করিল না। প্রমথ আজ একঘণ্টা আগে আপিস যাইবে ইহার দায়িত্ব যে তার নয়, ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিতেও তার বাধিল না।

জীর্ণ সিঁড়িটার উপরের ধাপে দাঁড়াইয়া বিমল অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বোনের প্রতিবাদের ভঙ্গিটা লক্ষ করিয়া দেখিল।

ক্রুদ্ধা মেয়েটা রান্নাঘবের দবজায় ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে, সামনে এত বড়ো মেয়েকে মারিতে না পারার জন্য দুঃখিত প্রমথ।

আজ তার কী করব? আগে বললে না কেন?

তুই মর। আগে তুই ভাত চাপাতে পারলি না?

না, পারলাম না। আমি গুনে জানব আজ তোমার আগে ভাত চাই ?

মেয়েটা সত্যই বিদ্রোহ করিবে নাকি ? লাবণ্যের সঙ্গে লখনৌ চলিয়াছে বলিয়া বাপের সঙ্গে কলহ করার মতো দুঃসাহসী হইয়া উঠিবে ? প্রমীলার খোঁপা খুলিয়া গিয়াছিল, হলুদ মাখা হাত দিয়াই সে খোঁপাটা আটকাইয়া ফেলিল। যেন এ কাজটা শেষ করিয়াই সে ভয়ানক একটা কিছু করিয়া বসিবে।

অনুরূপা আজকাল নড়াচড়া করিতে পারে না—ডান পায়ে কী যেন হইয়াছে, হাঁটিতে কষ্ট হয়। তাছাড়া ছেলে হওয়ার দিনও তাহার ঘনাইয়া আসিল।

ঘরের ভিতর হইতে সে চ্যাচাইয়া বলিল, চুপ কর মিলি, চুপ কর। লজ্জা নেই তোর, বাপের মুখের ওপর জবাব দিচ্ছিস ?

জবাব আবার দিচ্ছে কে ? বলিয়া প্রমীলা রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রমথ খানিক গর্জন করিল, শেষে—

খেয়ে খেয়ে তেল বেড়েছে—এ বেলা তুই খেতে পাবিনে। একবেলা খেতে না পেলে তেল কমবে। এ বেলা তোর খাওয়া বন্ধ—যদি খাস তো গোবুর রক্ত খাস।

—বলিয়া সে স্নান করিতে গেল। চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, খেলেই বা কে দেখতে আসছে ? আমি তো থাকব আপিসে। ও যা মেয়ে, ও গোবুর রক্তও খেতে পারে—চাল চুরি করে খায় !

প্রমীলার চাল খাওয়ার কথাটা সত্য, তবে ঠিক চুরি করিয়া নয়।

আজকাল আর সকালে আলুভাতে ভাত হয় না, পাঁচুর আর তার পেটের বোন অনিলার জন্য দু পয়সার মুড়ি বরাদ্দ আছে—কিংবা সকলের জন্য রাত্রে যে আটার রুটি হয় বাড়তি

থাকিলে তারা তাই খায়। বিমলের জন্য বাড়িতে জলখাবারেব কোনো ব্যবস্থা নাই কিন্তু বাড়িব বড়ো ছেলে বলিয়া মাসের প্রথমে জলখাবারের দবুন তাকে তিনটি টাকা দেওয়া হয়। প্রমথ নিকটস্থ চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়িতে গিয়া কিছু খাইয়া আসে কি আসে না সে খবব কেহ পায় না।

প্রমীলার জন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। বিকালে ভাইবোনদেব সঙ্গে সে পাউরুটির ভাগ পায়, কিন্তু সকালে তার ক্ষুধার সম্ভাবনাকে কেহ স্বীকার করে না। একদিন কী মনে করিয়া, সম্ভবত কিছু মনে না করিয়াই সে রান্নার চাল একমুষ্টি চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন তার স্বাস্থ্য ভালো হইতেছিল—ক্ষুধার দাবি আশ্চর্য রকম প্রবল। চাল চিবানোর এক্সপেরিমেন্টটা সে একদিনে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এবং সেই জন্যই ব্যাপারটা গোপন থাকে নাই। একদিনে সকলে মিলিয়া (বিমল বাদ) তার লজ্জার বোঝা এত বাড়াইয়া দিয়াছিল যে, পরদিন তার জন্য মুড়ির ব্যবস্থা হইলেও তার ক্ষুধা পায় নাই, ববং বাটিতে এক পয়সার মুড়ি সামনে নিয়া বসিয়া অপমানে তার চোখে জল আসিয়াছিল।

কিন্তু কাঁদে নাই। প্রমীলা কোনোদিন কাঁদে না।

সে না কাঁদুক, প্রমথের পরিবর্তন হইয়াছে। স্বভাবেব উগ্রতা একেবারে যায় নাই, কিন্তু সকলকে সে যেন আজকাল ভয় করিতে শুবু করিয়াছে—ছেলেমেয়েকে পর্যন্ত সে আজকাল সোজাসুজি আঘাত করিতে অস্বস্তি বোধ করে। প্রমীলাব একবেলাব খাওয়া বন্ধ কবিতে সে আজকাল তাই দিবি৷ দেয়, পুরাতন অপরাধের কথা তুলিযা লজ্জা দিবার চেষ্টা করে।

আধসিদ্ধ ভাত গিলিয়া আপিস যাওয়ার সময প্রমথ বলিয়া গেল, ভাত খাস বে মিনি, বুঝলি ?

প্রমীলা ঘবেব ভিতর ঘাড় হেঁট কবিয়া বসিয়া বহিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রমথ চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেয়েকে দু-একটি মিষ্টি কথা বলিয়া যাওয়ার প্রেরণাটা এত প্রবল যে না বলিয়া চলিয়া যাইতে পা ওঠে না, অথচ ওবকম অনভ্যস্ত কাজটা সহসা কবিযা ফেলাও যায় না।

খানিক ছটফট করিয়া প্রমথ হঠাৎ বলিল, এক গ্লাস জল দে তো।

প্রমীলা নীরবে জল দিল।

প্রমথ আগেই যথেষ্ট জল পান করিযাছিল, তবু গেলাসটা অর্ধেক খালি কবিযা ফেলিল।

ভাত খাস বুঝলি ?

বলিয়া আরও স্নেহ প্রকাশ করিয়া ফেলার ভয়ে ডান বগলেব কাগজপত্রের বান্ডিলটা কোটের বাঁদিকের পকেটে ঢুকাইবাব চেষ্টা কবিতে করিতে একরকম পালাইয়া গেল।

প্রমথের পরিবর্তন হইযাছে।

ভাত খাইতে বসিয়া বিমল বোনকে আরও একটু পরীক্ষা কবিবার জন্য জিজ্ঞাসা কবিল, তোব মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে ?

বাবা চাল চুরির অপবাদ দিয়ে গেল শুনলে না ?

বাবার কথায় বুঝি মানুষের মুখ শুকনো হয় ?

সকালে বিমল প্রমীলার মাকড়ি ফেরত আনিয়াছিল, নগেনের লখনৌ যাওয়ার খবরটা দেওযার গোলমালে মাকড়ি দিতে মনে ছিল না। মাকড়ির কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল। মাছের ঝোলেব আলুর টুকরা কয়টা পাঁচুর পাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, সে তুই ছেলেমানুষ বলে। কেউ যখন কিছু বলে, তখন কেন বলেছে সেটা বুঝতে হয়। সেই দিন তুই আমায় মাকড়ি-চোর বললি। আমি রাগ করেছিলাম ? আমার তোর উপর তখন অন্য কারণে ভীষণ রাগ হয়েছিল, কী আর করিস তুই, আমায় চোর বলে একটু স্বস্তি পেলি।

প্রমীলা বলিল, অন্য কারণে রাগ হয়েছিল মানে ?

বিমল বলিল, মানে তুই জানিস। যাই হোক, তোর মাকড়ি এনেছি।

এনেছ ? বাঁচলাম। তোমায় চোর বলার শাস্তি পাওয়াব জন্য মনটা ছটফট করছিল।

বিমল খুশি হইয়া হাসিল।

প্রমীলা রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। বিমলকে খানিকটা ডাল আনিয়া দিয়া বলিল, মানুষ যে তার মুদ্রাদোষ নয় সেটা আমি কিন্তু অনেকদিন থেকে জানি দাদা। হাতে কটা টাকা এলেই দুল কিনে দিয়ে শাস্তি আরও বাড়িয়ো না।

তোকে দুল কিনে দেবার জন্য আমার ঘুম আসছে না—বলিয়া বিমল অনিলার মাছের কাঁটা বাছিয়া দিতে আরম্ভ কবিল।

অধর আজও বাড়িতে আছে টের পাইয়া দুপুরটা বিমল পাড়ায় তাস খেলিয়া কাটাইয়া আসিল।

খাসনি, মিলি ?

অন্যদিন প্রমীলার না খাওয়ার সম্ভাবনাটা বিমলের মনে থাকিত না। ভুলিয়া যাওযার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটা আজ কী কারণে বন্ধ হইযাছে।

প্রমীলা ইংরাজি পড়িতেছিল, নগেনের বউ হইতে গেলে মুখ্খু হইযা থাকিলে চলিবে কেন ? মাথা নাড়িয়া বলিল, রাত্রে খাব।

কাল রাত্রে কটা রুটি খেয়েছিলি ?

মিথ্যা বলিয়া বাহাদুরি করাব চেষ্টা প্রমীলা কখনও করে না, সে জন্য দাদার সহানুভূতি বাড়ানোর অপরাধ যদি হয় তার দোষ নাই। সে বলিল, দুটো।

নে খা।

চাযের দোকান হইতে বিমল গোটা তিনেক কেক কিনিয়া আনিযাছে।

প্রমীলা বিনা বাক্যব্যয়ে কেক তিনটা উদবস্থ করিল, জল খাইযা বলিল, কী গন্ধ ! পচা ডিম দিয়েছে নাকি ?

বিমল সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ভয় নেই, মরবি না। আমি ঢের খেয়েছি।

এই সব খাও তোমরা ? এই আরশোলার গন্ধ দেওয়া কেক ?

কেক কে খেল দিদি ? পাঁচু খবর নিতে আসিল।

প্রমীলা গম্ভীব হইয়া বলিল, আমি খেয়েছি। বাবাকে বলে দিবি তো ? বলিস।

পাঁচু বলিল, আমায় না দিলে বলে দেব।

বিমলেব মুখেব দিকে চাহিয়া প্রমীলা লজ্জার সঙ্গে হাসিল। বলিল, সবগুলো খেয়ে ফেললাম—একটা রাখা উচিত ছিল। তোকে বিকেলে এনে দেব পাঁচু।

প্রমীলার কযেক আনা পয়সা সঞ্চিত আছে।

সে আবার বলিল, নগেনবাবুদের বাড়ি থেকে আসবার সময় এনে দেব।

এবং এর নাম ডিপ্লোম্যাসি।

বিমল অবাক হইযা বলিল, নগেনদার বাড়ি যাবি নাকি ?

যাব। অনেকদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়নি। নিশ্চয় রাগ করেছে।

লক্ষ্মীদি ? সে তো শ্বশুরবাড়ি।

প্রমীলা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, আজ এসেছে।

তুই জানিস কী করে ? জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বিমল চুপ করিয়া রহিল। লক্ষ্মী আসে নাই, শীঘ্র আসিবেও না এবং প্রমীলা তাহা জানে।

আঁচল ঘষিয়া বিব্রত পাঁচুর ঘাড়ের ময়লা তুলিতে তুলিতে প্রমীলা বলিল, নিয়ে যাবে তো দাদা?

আমি? আমি এখুনি নগেনদাকে তুলে দিতে স্টেশনে যাচ্ছি।

প্রমীলা হার মানিল না, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, স্টেশন থেকে নিয়ে যেয়ো?

আমার সঙ্গে স্টেশনে যাবি?

দোষ কী?

কী দুঃসাহসী মেয়ে! বিমল চিন্তিত হইয়া উঠিল প্রমীলাকে স্টেশনে সে নিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাওয়া কি উচিত? তার পক্ষে, তার বোনের পক্ষে সে কত বড়ো অপমান।

মানে, একেবারে স্টেশনে গিয়া পলাতক প্রেমিককে পাকড়াও করিলে বোন তার কত নীচে নামিয়া যাইবে? নগেন ভাবিবে এ মেয়ের আত্মসম্মান বোধ নাই। লাবণ্য ভাবিবে, গরিবের মেয়েটা পায়ে পড়িতে আসিয়াছে। আর সর্বক্ষণ সে সচেতন হইয়া থাকিবে যে বোনকে সঙ্গে নিয়া সে স্বার্থের জন্য অম্লানবদনে অকথ্য অপমান সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে সকলে এই কথা ভাবিতেছে। হীন চক্রান্তটা তার এমনি করিয়া সে বোনের জন্য একটা বর গাঁথিতে চায়।

হয়তো এমন কথাও কারও মনে হইতে পারে যে, প্রমীলার কোনো দোষ নাই, তাকে জোর করিয়া সেই স্টেশনে আনিয়া ফেলিয়াছে।

অবশ্য লোকে কী ভাবিবে, না ভাবিবে সেটা বড়ো কথা নয়, লোকে অনেক কিছুই ভাবিয়া থাকে। আজ স্টেশনে না গিয়া যদি প্রমীলার উপায় না থাকে, তবে যাইতেই হইবে; ওদের যদি ঝগড়া হইয়া থাকে, শুধু রাগ করিয়াই যদি নগেন লাবণ্যের সঙ্গ নিয়া থাকে, তবে একটা বোঝাপড়ার জন্য স্টেশনে যাওয়াও প্রমীলার পক্ষে দোষের নয়—ওটুকু অপমান মানিয়া নিলে চলিবে না। কিন্তু শুধু ঝগড়ার জন্য নগেন কি তার বোনকে এমন শাস্তি দিবে? শেষ মুহূর্তে সকলের সামনে তাকে নত না করিয়া ছাড়িবে না?

যে একদিন স্ত্রী হইবে তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকে এতটুকু? বিশেষত নগেনের মতো মানুষের?

ওদের মধ্যে ব্যাপারটা যে সহজ নয় প্রমীলার স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছাই তার প্রমাণ। সুতরাং দায়িত্ব নগেনের আছে। এ ভাবে গিয়া দেখা করিয়া আসা প্রমীলা যে অপরিহার্য মনে করিতেছে, এ অবস্থাটা নগেনই সৃষ্টি করিয়াছে। এ তবে তার কেমন ব্যবহার?

বিমল ভালো করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না। তার মনে হইল, ঝগড়া হয়তো নগেন করে নাই, প্রমীলাকে শাস্তি দিতে হয়তো সে চাহে না, নিছক ঘটনাচক্রেই সে লাবণ্যদের সঙ্গে বিদেশে যাইতেছে; ভয় পাইয়াছে প্রমীলা। নগেন অনেক দিন আসে নাই, তারপর একবার দেখা পর্যন্ত না করিয়া একটা ফাজিল অথচ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দূর দেশে চলিয়াছে, নানা আশঙ্কায় প্রমীলার বুক কাঁপিতেছে। কে কী ভাবিবে, নিজেকে কতখানি সস্তা করিয়া দেওয়া হইবে, অপমানই বা কতখানি জুটিবে এ সব ভাবিবার সময় তাহার নাই।

কথাটা ভাবিবার সময় ছিল না। যাইতে হইলে এখনই রওনা হওয়া দরকার। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তুই স্টেশনে যাবি কী করে? ফিরে এসে তোকে নগেনদার বাড়ি নিয়ে যাবখন।

স্টেশনে না গিয়া যদি উপায় না থাকে প্রমীলা বারণ শুনিবে না।

প্রমীলা বারণ শুনিল না। বলিল, না না, তখন সময় হবে না দাদা। স্টেশন হয়ে একেবারে চলে যাব? ফিরে এসে আমায় রাঁধতে হবে না?

বিমল বলিল, তবে কাপড় পরে নে। কিন্তু তোর মন বড়ো ছোটো হয়ে গেছে মিলি।

প্রমীলা বোধ হয় মনে মনে বলিল, হোক। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলিল না। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াইয়া কাপড় বদলাইয়া তৈরি হইয়া নিল।

সমস্ত পথ বিমল একটি কথা বলিল না, বাসের প্রত্যেকটি লোকের মুখে বিমল অন্তরালের মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিল। ইহাদের অনেকেরই গৃহ এবং গৃহিণী আছে, কিন্তু একটা রোগা আর ফরসা আর কাঁদো-কাঁদো মেয়ের উপস্থিতিতে কী করুণ ওদের আত্মনিগ্রহ !

স্টেশনে পৌঁছিয়া বিমল ঘড়ি দেখিল। গাড়ি ছাড়িতে মিনিট পনেরো বাকি আছে। বলিল, ওরা গাড়িতে উঠে বসেছে নিশ্চয়—দাঁড়া প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনি।

প্রমীলা বলিল, দাদা শোনো। লাবণ্য কী ভাববে ?

জানি না।

হাসবে ?

নিশ্চয় হাসবে। মুচকে মুচকে হাসবে।

আমি যাব না।

ব্যস ! বিমলের বিরক্তির সীমা রহিল না—তোর মাথায় ছিট আছে নাকি ?

প্রমীলার ফিট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ভয়ে ভয়ে সে বলিল, আমি ওয়েটিং রুমে বসছি, তুমি দেখা করে এসো।

যা, মরগে যা।

অল্প দূরেই মেয়েদের ওয়েটিং রুম, প্রমীলা সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। দরজার পাশ হইতে চাহিয়া দেখিল, বিমল একটি সিগারেট ধরাইয়াছে এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সিগারেটটা আধখানা পুড়িয়া গেলে বিমল প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনিয়া নগেনকে খুঁজিতে গেল।

একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছে। লাবণ্যদের পরিবারটি বিশেষ বড়ো নয়, কিন্তু লাবণ্যের বাবা ভয়ানক মোটা, একাই তিনি গাড়িখানা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ফ্রক পরা দুটি মেয়ে আছে, বছর দশেকের একটি অসুস্থ ছেলে আছে। আর আছে লাবণ্য স্বয়ং। সজনীর জিনিসপত্র গাড়িতে আছে, কিন্তু সে নিজে অনুপস্থিত। বুকস্টলের পিছনে চাপা গলায় সে কাকিমার সঙ্গে কলহ করিতেছে।

গাড়ির মধ্যে এককোণে বসিয়া নগেন কাগজ পড়িতেছে। লাবণ্যের সঙ্গে তার যেন কোনো সম্পর্ক নাই।

লাবণ্যের বাবা কমলবাবু বিশেষ কারণে বিমলকে দেখিতে পারেন না। এখনও তিনি তাহাকে দেখিতে পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না।

লাবণ্য বলিল, কবি যে ! তারপর গলা খুব নামাইয়া বলিল, কাকে তুলে দিতে এলে বল তো আমাকে? বিশ্বাস হয় না।

বুঢ় কথা শুনতে তোমার এত আগ্রহ কেন ? আমি কাউকেই তুলে দিতে আসিনি। নগেনদার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

লাবণ্য বলিল, তুমি যে দরকারবাদী কবি অনেকদিন তা টের পেয়েছি।

বিমল ডাকিয়া বলিল, নগেনদা, একবার নেমে এসো—কথা আছে।

নগেন নামিয়া আসিল।

এসো আমার সঙ্গে, বলিয়া অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে হাত ধরিয়া সে নগেনকে টানিয়া নিয়া চলিল।

প্রমীলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

খবরটা এমন অবিশ্বাস্য যে, নগেন পর্যন্ত কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। অথচ সকল অবস্থাতে মানানসই কথা বলার মতো সহজ কাজ তার কাছে আর কিছুই নয়।

প্রমীলা এসেছে ?

হ্যাঁ। ওয়েটিং রুমে বসে আছে।

দ্যাখো দিকি ছেলেমানুষি। নগেন একটু হাসিল। তার কথার সুরে মনে হইল প্রমীলার স্টেশনে আসার মধ্যে ছেলেমানুষি ভিন্ন সত্যসত্যই আর কিছু নাই।

বিমল তার হাত ছাড়িয়া দিল।

নগেন আবার বলিল, সকালে একটা খবর পেলে আমিই তোমাদের বাড়ি যেতাম বিমল। এমনিই যেতাম, ভেবেও ছিলাম যাব—সময় পেলাম না। ক'দিন নিশ্বাস ফেলার অবসর পাইনি। তা ছাড়া মনে করলাম, একমাস পরেই তো ফিরছি—

বিমল বাধা দিয়া বলিল, থাক, নগেনদা।

নগেন আহত বিস্ময়ে চুপ করিয়া গেল। এমন সুস্পষ্ট পরাজয় জীবনে সে ভোগ করে নাই, এমন আবোল-তাবোল কথা বলার মতো বিচলিতও হয় নাই। প্রমীলার মতো ভীরু সাধারণ মেয়ে যে আকস্মিক দুঃসাহসিকতায় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে, নগেনের সে ধারণা ছিল না। এ অবস্থাটিকে যে কেমন করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, এখনও সে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই অথচ এখনই তাহাকে প্রমীলার সামনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তার জীবনে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব।

প্রমীলাকে ডাকিয়া দিয়া বিমল বলিল, তোরা কথা ক, আমি চট করে এক কাপ চা খেয়ে আসছি।

নগেন হাসিয়া কহিল, ট্রেন ফেল করে দিয়ো না বিমল।

না। ভয় নাই।

যাওয়ার আগে বিমল শুনিয়া গেল নগেন বলিতেছে, তোমার রাগ হয়েছে নাকি, মিলি ?

গাড়ি ছাড়িবার দুই মিনিট পূর্বে বিমল ফিরিয়া আসিল। নগেন চলিয়া গিয়াছে। প্রমীলা হাসিমুখে চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

ভয়ে এতক্ষণ প্রমীলার লজ্জা ছিল না। এবার দাদাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া গেল।

চল, বাড়ি যাই।

চলো।

বাড়ি ফেরার সময় সমস্ত পথ বিমল বিরক্ত হইয়া রহিল। এখন আর তাহার কোনো সন্দেহ নাই যে সবটাই প্রমীলার ছেলেমানুষি। ওর ক্ষতি হইল, না লাভ হইল কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু মাঝখান হইতে নিজেকে অপমানিত করিল, নগেনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিল। বিমলের মনে হইতে লাগিল, মেয়ে জাতটার মতো হ্যাবলা জাত পৃথিবীতে নাই। এবং নিজেও সে কম বোকা নয়। প্রমীলা নগেনকে ডাকিয়া দিতে বলে নাই। ও বাহাদুরিটা করিবার তার কী দরকার ছিল ?

এদিকে বুকস্টলের পিছনে সজনী ও কাকিমার কলহের শেষ নাই। একা একা বেড়াইতে যাওয়া প্রথম হইতেই সজনীর মনঃপূত হয় নাই, কাকিমা কথাটা পাড়া অবধি ওই নিয়া তাহাদের কথা কাটাকাটি শুরু হইয়াছে। সজনীকে রাজি করানোর জন্য যে কাণ্ডটা কাকিমাকে করিতে হইয়াছে, সে শুধু কাকিমাই জানেন, বিষ খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পর্যন্ত ফল হয় নাই সজনী এতখানি বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

তুমি যাবে না কেন ?

কতবার বলব ? দশদিন বাদে দিদিরা আসবে। আমি এখন কোথাও যেতে পারব না।

তবে আমিও পারব না।

কেন আমার যাওয়া না-যাওয়ার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী শুনি ? তোমার দিদি আসবে ?

আমার অত বেড়াবার শখ নেই।

দ্যাখো, ভালো হবে না বলছি। নগেনের সঙ্গে যদি তুমি না যাও, আমার যেদিকে চোখ যাবে চলে যাব—চোখের সামনে এমন করে তুমি অধঃপাতে যাবে, এ আমি দেখতে পারব না। যাবে না ? ঠিক করে বলো। যাবে না তো ?

তুমি যাবে না কেন ?

একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে কাকিমার এবার রাগ হয়।

সেটা বোঝ না? কচি খোকা নাকি ?

তখন সজনী করুণ সুরে বলে, আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

কাকিমা তৎক্ষণাৎ সুর নরম করেন, ছোটো ছেলের মতো স্বামীকে বোঝান, আদর করিয়া বলেন, দ্যাখো, আজ কত বছর একদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাই তো আমাদের এত ঝগড়া হচ্ছে। একটি মাস তুমি বাইরে ঘুরে এসো দেখবে আর ঝগড়া হবে না। বলিয়া একটু হাসেন, বিরহের অভাবে আমাদের মিলন যে তিতো হয়ে গেল গো !

শুনিয়া তখনকার মতো অভিভূত হইয়া সজনী বলে, আচ্ছা, যাব।

কিন্তু খানিক পরেই বলে, দ্যাখো, এখন গিয়ে বিশেষ কী লাভ হবে? আব অত লোকের সঙ্গে যেতে আমার ভালোও লাগবে না। আমি বরং পুজোর সময় নিজেই যাব।

তখন আবার গোড়া হইতে সব শুরু হয়। কাকিমা কাঁদেন, বলেন, বুঝেছি, আমি না মরলে তোমার উপায় নেই। আমি না হয় মরবই। তখন তোমাব অম্বলের অসুখ হোক আব অনিদ্রাবোগ হোক আমি দেখতে আসব না—তোমার যা খুশি কোরো।....তোমার লজ্জা নেই ? বউ কী মানুষেব থাকে না ? হলামই বা বউ, মেয়েমানুষের আঁচল চাপা হয়ে থাকতে তোমাব মাথা কাটা যায় ? এ কী ! কুঁড়ে বলে মানুষ এমন হয় ?

স্টেশনে আসিযা সজনী তার মেয়াদ কমাইবার জন্য আবদার ধরিয়াছে। পরের বাড়িতে সে একমাস থাকিবে কেমন করিযা ? পরের বাড়ি পনেরো দিন বড়ো জোর থাকা যায়, তার বেশি নয়।

আর পনেরো দিন হোটেলে থেকো।

তা হলে মরেই যাব।

নগেন তোমার পর ? ও তো বাড়ি ভাড়া করবেই—

নগেনকে আমি দেখতে পারি না, ও ভয়ানক গম্ভীর। ওর সঙ্গে একমাস এক বাড়িতে থাকলে আমি খেপেই যাব।

কাকিমা সংক্ষেপে বলিলেন, তাই বরং যেয়ো, কিন্তু একমাসের মধ্যে ফিরে এসো না। এলে, দিদির সঙ্গে আমি বর্মা চলে যাব।

সজনী আহত হইয়া বলিল, আচ্ছা তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

তখন গাড়ি ছাড়ার সময় হইয়াছে। সজনী গটগট করিয়া গাড়িতে উঠিয়া ওদিকেব আসনে বসিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, কী সজনীবাবু, পরামর্শ শেষ হল ?

কিন্তু সজনী কথা কহিল না। রাগে, দুঃখে, অভিমানে তার চোখে জল আসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। সে চোর, না ডাকাত যে এ ভাবে ধরিয়া বাঁধিয়া তাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হইতেছে? নিজের শান্ত নির্জন গৃহে পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারটির জন্য সজনীর মন কেমন করিতে লাগিল। ঘরের আরামপ্রদ কোণটি ছাড়িয়া মানুষের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িতে তার যে মাথা ঘোরে, ভয় হয়, অস্বস্তি ও অশান্তির সীমা থাকে না, এ কথা সবচেয়ে ভালো করিয়া যে জানে, সেই কিনা তার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিল !

শেষ মুহূর্তে সজনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল অত্যাচারী স্ত্রীটি তাহার প্ল্যাটফর্মে পরিত্যক্ত বিপন্নার মতো একাকিনী দাঁড়াইয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। সজনীর মনে হইল ওর দুচোখ জলে ভরতি।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করা মাত্র দরজা খুলিয়া সে টুক করিয়া নামিয়া গেল। সলজ্জ হাসির সঙ্গে নগেনকে বলিল, আমি কদিন পরে যাব নগেন। কাল কোর্টে মস্ত একটা মোকদ্দমা আছে—মনে ছিল না।

সজনীর সম্পত্তি আছে সুতরাং সে মকদ্দমারও অধিকারী।

কাকিমা হাসিবেন, না কাঁদিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। গাড়ি বাহির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর বলিলেন, এটা কী করলে ?

সজনী ভীতভাবে চুপ করিয়া রহিল। কী যে করিয়া ফেলিয়াছে সেও ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

কাকিমা বলিলেন, চলো বাড়ি চলে যাই। আমার আব মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না।

মুখে এ কথা বলিলেও মনে মনে তিনি এত খুশি হইযাছিলেন যে, উপভোগে বাধা পড়িবে ভয়ে বিমল ও প্রমীলাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেও ডাকিবার চেষ্টা করিলেন না।

মোটরে বসিয়া ব্রিজ পর্যন্ত সজনী কোনো রকমে চুপ করিয়া রহিল। তারপব বলিল, বিমল আর ওর বোনকে স্টেশনে দেখলাম।

কাকিমা বলিলেন, ডাকলে না কেন ?

এমনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্যদিন ছুটি শেষ হইলে অধর আপিসে যাইবে শান্তা এই রকম একটা আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাব আশা পূর্ণ হইল না। অধব আরও সাতদিনের ছুটি নিল।

শান্তার বিবর্ণ মুখভাব লক্ষ করিয়া সে হাসিয়া বলিল, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এর পর তোমায় ছেড়ে আপিস যেতে কষ্ট হবে—বলিয়া মুখের হাসি আরও ব্যাপক করিয়া যোগ দিল, এ সাত দিন বাদ দিলেও আর এক মাস ছুটি পাওনা আছে—আপিস যেতে ইচ্ছা না হয়, দেব ঝেড়ে আর একটা দরখাস্ত ! কী বল ?

হাত বাড়াইয়া অধর স্ত্রীর গাল টিপিয়া দিল ; আরও এক মাস ছুটি নেওয়ার কথা ভাবিয়াই তার যেন খুশির সীমা নাই।

শান্তা ভয়ে ভয়ে বলিল, অনেক দিন মামাকে দেখিনি, নিয়ে যাবে ?

অধর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমি ? আমি যাব তোমার ওই ছোটোলোক মামার বাড়ি ?

শান্তা আরও আস্তে বলিল, আমায় পাঠিয়ে দাও।

অধর আরও আশ্চর্য হইয়া বলিল, বিয়ের আগে ওরা তোমায় কী রকম কষ্ট দিত সব তো শুনেছি শান্তা, তুমি কি মনে কর তারপরেও তোমাকে আমি ওদের ওখানে পাঠাব ? তারপর গলা মোলায়েম করিয়া, তা ছাড়া, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ও সব যাওয়ার কথা-টথা বোলো না বাবু শুনতে ভয় করে।

শান্তার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। অধরের মুখে এ সব কথা যে কী পরিমাণ বেমানান হয়, শুনিলে খট করিয়া কানে বাজিয়া কী অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হয় অধর তাহা জানে, তবু সে এ সব কথা বলে কী করিয়া ?

মামা আমায় কষ্ট দেয়নি। মামিমাই একটু-আধটু বকত।

অধর শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল, একটু-আধটু বকত ! এ দাগটা কীসের গো ?

শান্তাকে কাছে টানিয়া তাহার বাহুমূলের পোড়া দাগটিতে অধর হাত বুলাইতে লাগিল। অল্পে অল্পে হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, আমি থাকলে তোমার মামিমাকে সেদিন জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম। কী যন্ত্রণাটাই তুমি পেয়েছিলে !

শান্তা বলিল, ওটা তো মামিমা পোড়ায়নি, রাঁধতে তেল জ্বলে উঠে পুড়ে গিয়েছিল।

অধর অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, ও সব বললে এখন শুনবে কে ? তেল জ্বলে উঠলে এখানটা পুড়তে পারে নাকি ? না না, ওখানে তোমায় আমি পাঠাব না। একটু আবৃত্তি কর না, শুনি ?

কী আবৃত্তি করব ?

স্বপন-পশারী থেকে করো।

পরদিন শান্তা বলিল, আচ্ছা, ঠাকুরঝিকে আনাবে না একবার ? ঠাকুরঝি রাগ করবে।

পাঠালে তো আনব ?

পাঠাবে বইকী। ঠাকুরজামাই লোক ভালো।

ঠাকুরজামাই তো আর পাঠাবে না, পাঠাবে ঠাকুরজামাইয়ের পিতাঠাকুর। আমি চিঠি লিখেছিলাম, এখন পাঠাতে পারবে না জানিয়েছে। বুড়ো কী কম বজ্জাত !....এখানে বোসো তো।

অধর জানালার কাছে চেয়ারটা দেখাইয়া দিল।

কেন ?

বোসো না। বলছি।

শান্তা বসিল। অধর বলিল, সোজা হয়ে বোসো—অত শক্ত হয়ে নয়, বেশ আলগা দিয়ে বোসো—মাথাটা একটু হেঁট করো, অত নয়, অল্প একটু—ব্যস্‌। ডানদিকে একটু মুখ ফিরাও। কাঁধ থেকে আঁচলটা নামিয়ে দাও। এবার চুপ করে বসে থাকো, নড়ো না।

অধর খাটের প্রান্তে বসিয়া তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শান্তাকে দেখিতে লাগিল।

তোমার মুখের বাঁদিকে আলো পড়েছে, ডান দিকে ছায়া। কী যে তোমায় দেখাচ্ছে শান্তা ! আমি উপমা দিতে জানি না কিন্তু—দাঁড়াও, ছায়াটা আরও গাঢ় করে দি।

উঠিয়া গিয়া অধর এদিকের জানালাটা বন্ধ করিল, কপাট ভেজাইয়া দিল। আলো ও ছায়ার ভাগাভাগিতে শান্তার সু-সামঞ্জসিত মুখখানি কুৎসিত হইয়া গেল।

তেমনই ভাবে অধর তাহাকে পুরা আধঘণ্টা বসাইয়া রাখিল। বিমলেব নয়, সে গল্পে পড়া কবির নকল করিতেছে, যে কবি মানবোচিত কিছুই করে না শুধু প্রিয়ার কথা ভাবে, প্রিয়াকে কোনো কথা ভাবায় না ; প্রিয়াকে নিয়া খেলা করে, প্রিয়াকে খেলিতে দেয় না এবং কাছে থাকিয়াও ব্যবধান বজায় রাখিয়া শুধু প্রিয়াকে চাহিয়া দ্যাখে, প্রিয়া নড়াচাড়া করিলে স্বপ্ন ভাঙিয়া যাওয়ার দুঃখে হতাশ বোধ করে।

অপমানে শান্তার দুই কান ঝাঁঝাঁ করিতে লাগিল। আধখোলা বুকের কাছে দুটি হাত জড়ো করিয়া নির্বাক নিশ্চল ছবিটি হইয়া বসিয়া থাকার জন্য সে জন্ম নিয়াছিল নাকি ? সে কী সার্কাসের পোষা জন্তু ? তাকে নিয়া এ ভাবে আমোদ করিবার অধিকার ও লোকটাকে কে দিয়াছে ?

বিমল তাহাকে নিয়া একদিন এমনই কাব্য করিয়াছিল—কিন্তু এ ভাবে নয়। এমন রূঢ় নির্মম আমোদের জন্যে নয়।

বিমলের পাশের বাড়ির নিমগাছটা তখনও সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয় নাই, কিছু কিছু পাতা আছে। বিকালের দিকে গাছটির আলোছায়ায় বোনা ছায়া বিমলদের ছোটো উঠানটির অর্ধেক ঢাকিয়া দিয়াছিল।

বিমল সহসা বলিয়াছিল, একটা মজা দেখবেন ?

কী মজা ?

এখানে এসে দাঁড়ান, আমাদের বাড়ির কার্নিশের পাশ দিয়ে আপনাদের বাড়ির ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন। পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকলেই দেখবেন আমাদের বাড়িটা ওপরে উঠেছে।

সে অবিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিল, যান, তাই কখনও হয় ?

পরীক্ষা করেই দেখুন না।

ফাঁকি দিয়া ধার করা ক্যামেরায় বিমল তাহার ফটো তুলিয়া নিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে রাগ করিতে দেখিয়া হাসে নাই।

দোষ হয়ে থাকলে বলুন নষ্ট করে ফেলছি। প্রমীলাকে জিজ্ঞাসা করুন ওর ফটোও নিয়েছি। ফটো নিলে দোষ কী আর ?

সেদিন বিমলের ছেলেমানুষি ভালো লাগে নাই। আজ তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল বিমলের কাছে গিয়া অনুনয় করিয়া বলে, আর একটা ফটো নেবেন ? যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি দাঁড় করিয়ে দিন আমাকে।

ফটোটা ভালো ওঠে নাই। শান্তার সর্বাঙ্গে কে যেন সাদা-কালো ছোপ দিয়া দিয়াছে, দেখিলে হাসি পায়, বিমল ফটোগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। শান্তার যে মুখ দেখিলে হাসি পায়, সে মুখ দেখিয়া বিমল করিবে কী ?

ইতিমধ্যে সে ক্যামেরাটি আরেকবার ধার করিয়া আনিয়া দু দিন রাখিয়াছিল, অধরের চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ি থাকার রকম দেখিয়া ফেরত দিয়া আসিয়াছে।

প্রমীলাকে স্টেশনে নিয়া গিয়া অপমানিত হইয়া আসার পরদিন সকালে নগেনের চিঠি নিয়া বিমল আলিপুরে হেডউড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

রবিবারের সকাল, হেডউড চার্চে ধর্ম করিতে গিয়াছিল। একঘণ্টা ধরিয়া তাহার বাগানের ফুলগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া বিমল বিরক্ত হইয়া উঠিল। সাহেবের কুকুরটা তাহাকে ভালোবাসিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লেজ নাড়িয়াছে, তবু।

নগেনের চিঠি পড়িয়া হেডউড বহুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, শেষে বলিল, This is too much !

কিন্তু চাকরি সে বিমলকে দিল। একটা স্লিপ টানিয়া নিয়া খসখস করিয়া কী কতগুলি লিখিয়া বিমলের হাতে দিল। কাল বেলা একটার সময় আপিসে গিয়া বড়োবাবুর হাতে স্লিপটা দিতে হইবে।

Don't come before one p.m.

বিমল বলিল, No, Sir !

আর বোসের সঙ্গে দেখা হলে বোলো যে আমি বলেছি, This is too much. Don't forget. Let that Shylock understand, this is too much. You can go.

গেট পার হইয়া বিমল রাস্তায় পা দিয়াছে, বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, সাহেব ডাকিতেছে।

হেডউড বলিল, শোনো বাবু ! বোসকে কিছু বলবার দরকার নেই।

এও নগেনকে ভয় করে ! বিমল বলিল, No, Sir !

বাড়ি ফেরার পথে চাকরি পাওয়ার আনন্দে নিজেকে বিমল কিছুমাত্র উত্তেজিত দেখিল না। মনের মধ্যে কোথায় যেন বিঁধিতেছিল। বোনকে যে স্টেশনে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য করে তার অনুগ্রহে চাকরি পাওয়া যেন খুব অগৌরবের কথা, অন্যায়।

অথচ, নগেনের হয়তো কোনো দোষই ছিল না।

কয়দিন কবিতা বাহির হইতেছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ মিল সব যেন একসঙ্গে আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। আজ বিকালে ঘরের জানালায় এক মুহূর্তের জন্য শান্তার অসুস্থ বিবর্ণ মুখ দেখিয়া বিমলের মন এত খারাপ হইয়া গেল যে, রাত্রে জীবনে এই প্রথম চেষ্টা করিয়া কবিতা লিখিতে বসিল। এবং কতকগুলি বাজে লাইন লিখিয়া তার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। আলো নিভাইয়া সে শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ঘুম আসিতে দেরি হইল। এবং তারই ফলে এই জ্ঞান লাভ করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল যে প্রমীলা এত রাত্রে না ঘুমাইয়া কাঁদে।

ভাইবোনের বিছানায় অত্যন্ত সংকীর্ণ একটু স্থানে গুটিসুটি হইয়া তাহাকে শুইতে হয়, তারই মধ্যে কী রকম কায়দা করিয়া সে বালিশে মুখ গুঁজিযাছে। বিমল অনেকক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কান্নায় তার শ্রদ্ধা নেই—কারণে, অকারণে ওরা এত কাঁদে ! কান্না যেন ওদের একটা বিলাসিতা। তবু প্রমীলার জীবনে যে ইতিমধ্যে—ধরিতে গেলে জীবন আরম্ভ হওয়ার আগেই—কান্নার আমদানি হইয়াছে, এ কথা জানিয়া রাত্রির অন্ধকারকে তাহার অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

এ রকম ইচ্ছার আরও একটা কারণ ছিল। নিজের অন্ধকাব ঘরে অবিন্যস্ত রুক্ষ শয্যায় নিজেব অতি নিকটে শান্তাকে আজ তাহার এত বেশি প্রয়োজন মনে হইতেছিল যে, একটা ভয়ানক কিছু করিয়া ফেলিবার ঝোঁক সে সামলাইতে পারিতেছিল না। এত রাত্রে কাঁদাকাটা করার জন্য প্রমীলাকে ধমকাইয়া দিবার ইচ্ছাটা কষ্টে দমন করিয়া বিমল নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। জানালার লোহার শিকে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, শান্তাকে ভালোবাসা কত বড়ো বোকামি হইয়া গিয়াছে। আজিকার চাকরি পাওয়ার যত যশ, অর্থ, সম্মান যাই সে পাক, জীবনে সব তাহাব তুচ্ছ হইয়া যাইবে, কারণ শান্তা তাহার কবিতার বদলে শুধু কাব্যরসই দিল, প্রেমকে মানিল না। মাসে একশো পঁচিশ টাকায় শান্তাকে সে খাওয়াইতে পারে না? কিন্তু শান্তা খাইবে না। তাহাকে খাওয়াইবার লোক আছে, ছেলেমেয়ে দিয়া তার সংসার রচনা করিবার লোক আছে, সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে তার সম্মানের আসনটি রিজার্ভ রাখার লোক আছে। জীবনে তাহার যাহা জোটে নাই, তার মতো মূর্খ অপদার্থ কবি ভিন্ন জগতে যে জিনিস দিবার ক্ষমতা কারও নাই শান্তা শুধু সেইটুকুই তার নিকট হইতে গ্রহণ করিল এবং এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিল যে গ্রহণ করাটাই বিনিময়।

পরদিন বেলা একটার সময় আপিসে গিয়া বিমল বড়োবাবুর হাতে সাহেবেব চিঠি দিল। বড়োবাবু খাতির করিয়া বলিলেন—তুমি লোকটা তো ভাগ্যবান হে ! এ পোস্টে লোক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

তার কী হল ?

একদিন কাজ করে পনেরো দিনের মাহিনা পেয়েছে।

কাজ শেখার ফাঁকে ফাঁকে লোকটির কথা না ভাবিয়া সে থাকিতে পারিল না। কার অনুগ্রহে তাহার চাকরিটি গেল জীবনে বোধ হয় সে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না। নগেনের এক মাইলের মধ্যে ও বোধ হয় কোনোদিন আসে নাই, সেই নগেনেরই প্রভাব ওর জীবনের শনিগ্রহের মতো কাজ করিয়াছে। জীবনের এক-একটা ব্যাপার কী জটিল !

পাঁচটার পর বাহিরে যাওয়ার পথে একটি যুবক বিমলের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অতিরিক্ত নীল দেওয়া ধোপদুরস্ত কাপড়ের উপর সে বাড়িতে সাবান দিয়া কাচা একটা শার্ট চাপাইয়াছে। মুখে চোখে একটা সকাতর বিদ্রোহের ছাপ।

চাকরিটা তা হলে আপনিই পেলেন ?

পেলাম।

পেলেন ? কেন পেলেন ?

শুনবেন কেন পেলাম ? মুরুব্বির জোরে ?

আপনি কী পাস জানতে পারি কি ?

বি এ।

আমি এম এ পাস করেছি।

বিমল বলিল, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এ পাস-ফেলের ব্যাপার নয়। যার যেমন কপাল।

আপনার চেয়ে আমার কপাল বেশি চওড়া। সাহেব বললে, সরি বাবু, আই হ্যাভ্ গট এ বেটার ম্যান ?

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি না।

যুবকটির চোখ ছলছল করিতে লাগিল। রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার দিকে চোখ রাখিয়া বলিল, কাল বাড়িতে পাঁচসিকের হরিলুট হয়ে গেছে। কত কাল পরে কাল বউ হাসিমুখে কথা বলেছিল। কাল দুবেলা ভাতের সঙ্গে কী পেয়েছি জানেন ? দুধ। আর বিকেলে লুচি জলখাবার। আচ্ছা নমস্কার !

লঘুপদে ধাপ কটি নামিয়া ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া সে দ্রুতগামী বাসটির সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল। বিমলের মনে হইল তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গিয়াছে। ছেলেটা শাস্তি দিল কাকে ?

ভিড় জমিবার আগে যতটুকু দেখা দরকার বিমল দেখিল। তারপর দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই, কোনো দায়িত্ব নাই। প্রত্যেক মাসে মাহিনা নেওয়ার সময় এদের কথা সে স্মরণ করিবে না। কাল বাংলা কাগজে লিখিবে মোটর দুর্ঘটনা, ইংরাজি কাগজে লিখিবে Motor Accident , লোকে কাগজ পড়িয়া এ ব্যাপার সম্বন্ধে যতটুকু জানিবে, সে নিজে তার কিছুই জানে না।

রাত্রে বিমল শান্তভাবে ঘুমাইল। ওদিকে নিদ্রাতুরা শান্তাকে অধর যে কত রাত অবধি জাগাইয়া রাখিল সে তার কোনো সংবাদ পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতখানি বেদনার সঙ্গে নারী মানুষকে পৃথিবীতে আনে, মানুষ বোধ হয় ঠিক ততখানি অনিচ্ছার সঙ্গে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়াটাকে মানুষ তাই এত ডরায়। অনিচ্ছায় পাওয়া পথিকবৃত্তি মৃত্যুভয়েই ধন্য হইয়া গিয়াছে। ছেলেটা বাস চাপা পড়িয়া মরিয়া তাই জানিয়া গেল ছোটো-ছোটো ব্যর্থতায় জীবনটা ভারাক্রান্ত হইলেও শক্তি তার কম নয়, প্রকৃতির সবচেয়ে প্রবল বন্ধনকে সে জয় করিয়াছে, না মরিবার লাখ লাখ সুযোগের একটা গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করে নাই।

কাল একটা লোককে বাস চাপা পড়তে দেখলাম মিলি।

কলকাতায় লোকে তো হরদম বাস চাপা পড়ছে।

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তুই কাল কাঁদছিলি কেন রে ?

কাল রাত্রে? তুমি জানলে কী করে ? মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই।

অত মন খারাপ করিস না, বুঝলি ?

বিমল আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

শান্তার কী হয়েছে রে ?

কপাল ফিরেছে। অধর ওকে মাথায় তুলে নাচছে।

ঠিক ! কম্পিটিশন ! স্ত্রীর হারানো হৃদয়টিকে অধর জয় করিতে চায়।

বিমল খুশি হইয়া উঠিল। শান্তার হৃদয় তবে সত্যই হারাইয়াছে। হারাইয়াছে মানেই সে পাইয়াছে। নয় কী ?

একটা ভারী মজা হইয়াছে। আজকাল আপিসে তাহার কবিতা লেখার ঝোঁক আসে। যে দুপুরগুলি আড্ডা দিয়া ঘুমাইয়া সে কাটাইয়া দিত, এখন সেগুলি মোটা মোটা টাকার হিসাব লিখিয়া, চিঠিপত্রের নকল করিয়া কাটে। কষ্ট হয়, মন বসে না। হাতে কলম ধরিয়া সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করা ভিন্ন আর কিছু করার উপায় থাকে না বলিয়া বাপমায়ের এক ছেলের মতো কল্পনা আশ্চর্য পায়।

অথচ একজন বাসচাপা-পড়া হতভাগার চেয়ারে বিনা অধিকারে বসিয়া, প্রমীলাকে রাতদুপুরে যে কাঁদায় তার অনুগ্রহে পাওয়া চাকরি করিতে করিতে কবিতা রচনার কথা ভাবাও উচিত নয়।

সন্ধ্যার পর কমার্শিয়াল স্কুলে টাইপরাইটিং শিখিতে যায়। স্কুলটা ভালো পাড়ায় নয়। কোনোদিন দু-একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বন্ধু হাসিয়া বলে, কদিন থেকে হে ? বিমল ভাবে, একদিন যদি অধরকে সে এখানে আবিষ্কার করিতে পারে ? কী নিশ্চিন্তই সে হইতে পারে সেদিন ! স্বামীত্বের সবগুলি সুযোগ নিয়া সারাজীবন চেষ্টা করিলেও সে যে শান্তার হৃদয় জয় করিতে পারিবে না এ বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ রাখার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু বিমল জানে অধরকে এ রাস্তায় হাঁটিতে দেখিলেও নিশ্চিন্ত সে হইতে পারিবে না, জানিবে তার মতো সঙ্গত কারণেই অধর এ পথে পা দিয়াছে। লোকটার মধ্যে হীনতা আছে, সংকীর্ণতা আছে, নির্মমতা আছে, কিন্তু বাজারের মেয়ে দরকার হওয়ার মতো ছোটোলোকোমি নাই। মদকে অধর গ্রহণ করিবে, কিন্তু মদের সঙ্গে যে মেয়েমানুষ খাপ খায়, তাহাকে কামনা করিবে না।

এইখানেই বিমলের ভয়। এ সব মানুষ যা ধরে তার শেষ না দেখিয়া ছাড়ে না। শান্তাকে সে যখন জয় করিতে চাহিয়াছে, হয় জয় করিবে, না হয় পাগল করিয়া ছাড়িবে। শান্তাও টের পাইবে ইহাকে ভালোবাসা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। এমন যার প্রেমের অভিযান, তাহাকে শান্তা প্রতিহত করিতে পারিবে কী ? তার সবচেয়ে মুশকিল হইবে অধর নিজেকে সকল অবস্থাতে অবলীলাক্রমে বাঁচাইয়া রাখিবে। বিমলের জন্য ওর বুকে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সে যদি খেপিয়া যায়, ওকে ভালো না বাসে সে হইবে শুধু তারই খেপিয়া যাওয়া, অধরের পরাজয় নয়। তাকে পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিয়া অধর বিবাহ করিবে এবং কী এক আশ্চর্য কৌশলে তার জন্য সঞ্চিত ভালোবাসার সবটুকু নতুন বউকে দান করিবে। বিবাহ যদি সে নাও করে, প্রিয়াকে পাগল করিয়া পাগলা গারদে পাঠানোর অকথ্য দুঃখটা মদ খাওয়ার মতো উপভোগ করিবে—ও যেরকম মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনাকেও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত টানিয়া চলিতে পারে। মানসিক বিপর্যয়ের লোভে যে ছড়ি দিয়া অন্ধ ভিখারির সর্বাঙ্গে দাগ কাটিয়া মুঠা ভরিয়া রূপা দেয় তাকে যে ভাঙা যায় না, শান্তা তাহা জানে। বিমলকে না ভুলিবার ও নিজের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব করিয়া তোলার মূল্য হিসাবে অধরকে সে যদি ভাঙিতে পর্যন্ত না পারে, কেন সে বিমলকে ভুলিয়া বাঁচিবে না ?

বাঁচিবার জন্য মানুষ ভালোবাসে। বাঁচিবার জন্য ভুলিতে পারে না।

মঙ্গলবার রাত্রে অনুরূপার একটি ছেলে হইয়াছে। মানুষের পৃথিবীতে আসার হাঙ্গামা বড়ো কম নয়। এই বৈচিত্র্যটুকুর জন্য প্রমীলা আর বিমল দুজনেই আগন্তুকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিয়াছে।

ওকে আমি মানুষ করব দাদা।

কাঁরস !

ওর নাম রাখব অমল।

রাখিস।

এইটুকু পুঁচকে হয়েছে ও আবার মানুষ হবে !

বলিতে বলিতে প্রমীলার মাথা খারাপ হইয়া যায়। যে আবহাওয়া এ বাড়ির, ছেলেমেয়ের সহজে সাধারণ মানুষ হওয়া কঠিন। ওর মধ্যে আবার কীসেব ছিট দেখা দিবে কে জানে ! দাদার মতো বয়স হওয়ার আগেই হযতো ও নিজেব জীবনটা জট পাকাইয়া ফেলিবে।

একদিন সকালের ডাকে প্রমীলার নামে একখানা খামের চিঠি আসিল এবং চিঠিখানা পড়িয়াই প্রমীলা বিবর্ণমুখে সেটি শেমিজের ভিতব চালান করিয়া দিল। বিমল ভূমিকাস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিল, আমার চিঠি নেই ?

না।

ওটা কার চিঠি ?

আমার।

কে লিখেছে ?

প্রমীলা চুপ কবিযা বহিল।

বিমল রুক্ষস্বরে বলিল, কাব চিঠি ? বল মিলি, ভালো চাস তো। খামের চিঠি না খুলে তোকে দেওয়া হয় এই তোর ভাগ্য বলে জানিস। গোপন কবিস কোন লজ্জায় ?

এ চিঠি তোমাকে দেখাতে পাবব না।

কার চিঠি বল।

প্রমীলা তবু চুপ কবিযা বহিল।

না বললে লাভ নেই মিলি। কেড়ে নেব। আমার একটা দায়িত্ব আছে।

ছেলেবেলা একটা সিকি কাড়িয়া নেওয়াব সময় প্রমীলার চোখে আর ঠোঁটে যে শব্দহীন কান্না দেখা দিয়াছিল, আজও তারই আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু আজ কাড়িয়া নিতে হইল না প্রমীলা নিজেই খামটা তাহাব হাতে তুলিয়া দিল। ভিতরে মোটা সাদা নোট পেপাবের ভাঁজে একখানা একশো টাকার নোট।

চিঠি কী হল ?

চিঠি ছিল না।

বিমল মুখ কালো কবিয়া বলিল, নগেনদা পাঠিয়েছে ?

প্রমীলা মৃদুস্ববে বলিল, জানি না।

লখনৌ-এর ছাপ বয়েছে। নগেনদা ছাড়া আর কে লখনৌ থেকে টাকা পাঠাবে ? তোকে আমার চাবকাতে ইচ্ছা করছে মিলি। এটা নিয়ে আমি এখন কী করি !

প্রমীলা তাহার এ সমস্যা সমাধানে কোনো সাহায্য কবিল না। একফাঁকে চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিয়া তরকারি কুটিতে বসিল। নোটটি হাতে নিয়া বিমল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার কাজ দেখিতে লাগিল।

নগেনদার কাছে তুই টাকা চেয়েছিলি ?

প্রমীলা মাথা নাড়িল।

তবু শুধু শুধু সে টাকা পাঠাল কেন ? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এ তার কী রকম ইয়ার্কি ? টাকা পাঠাবার সাহসই বা তাব হল কী করে ?

প্রমীলা অস্ফুট স্বরে বলিল, হয়তো লাবণ্য পাঠিয়েছে।

লাবণ্য ? লাবণ্য তোকে টাকা পাঠাতে যাবে কেন ? ওর টাকা বেশি হয়েছে নাকি ?

তা আমি জানি না।

তুই সব জানিস !

নোটটা বিমল গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। উপরে যাওয়ার আগে বলিয়া গেল—তোর টাকা, তোর অপমান নিয়ে যা খুশি তুই করবি যা। আমি কিছু জানি না।

সারাদিন বিমলের মনটা খচখচ করিতে লাগিল ! বোনের নামে একশো টাকার নোট আসার মধ্যে শুধু অকথ্য অপমান ও লজ্জা নয়, ভয় পাওয়ারও কারণ আছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। এ সব খাপছাড়া ব্যাপারের ফলাফল ভালো হয় না। নগেন পাঠাক আর লাবণ্যই পাঠাক, ও টাকাব মধ্যে প্রমীলার অমঙ্গলের ইঙ্গিত আছে।

বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া সে আর একটা দুঃসংবাদ পাইল। ঠিকা ঝি বাসন মাজিতে আসিয়া খবর দিয়াছে, শান্তারা চলিল। কোথায় চলিল, সে খবর সে পায় নাই, কিন্তু ওবা যে চলিল এ খবর ঠিক।

কীরে মিলি, এ কী ব্যাপাব ?

ব্যাপার তো শুনলে।

ওরা চলেছে কোথায় ?

তা জানি না। হয়তো অন্য বাড়িতে যাবে।

কিন্তু এটা তো অধরের নিজের বাড়ি ?

ভাড়া দেবে। নিজেরা ভালো বাড়িতে থাকবে।

সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু শান্তা যদি ভালো বাড়িতে থাকিতে না চায়, অধর তাহাকে গায়ের জোরে নিয়া যাইবে কোন হিসাবে ?

ব্যবস্থাটা তা হলে করছে অধর ?

আমি তা কী করে বলব ? হয়তো শান্তাও থাকতে চায় না।

এটাও অসম্ভব নয়। অবস্থা বুঝিয়া শান্তাই হয়তো নিজেই এ ব্যবস্থা করিয়াছে। বিমলকে যদি ভুলিতেই হয় দূরে গিয়া সে কাজটা করা সহজ।

কিন্তু কী স্বার্থপর ও মেয়েটা ! কী হীন সুবিধাবাদী ও !

সুবিধামতো ভাসা-ভাসা একটু খেলা করিয়া বিপদের সম্ভাবনাতেই ও পালাইয়া বাঁচিতে চায়। এমনিভাবে মজা করার চেয়ে সর্বনাশও মানুষের বেশি সম্মানজনক কাম্য নয় !

স্কুলে গিয়া টাইপরাইটারের চাবি টিপিতে টিপিতে বিমলের মাথা গরম হইয়া উঠিল। যে কথাটা ভাবিবার ক্ষমতা এতক্ষণ তাহার ছিল না, অনায়াসে সে এখন তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভাবিল, ভুলিবার জন্য শান্তা পালাইতে চায় এ কথা তাকে কে বলিয়াছে ? এত যে হিসাবি সে ভুলিবে কী ? ভুলিবার তার কী আছে ? মনে তার দাগ পড়িল কবে যে, দাগ তুলিবার দরকার হইবে ? ও সব বাজে কথা, কল্পনা। সে বিরক্ত করিবে এই ভয়ে শান্তা চলিয়া যাইতেছে। ইদানীং যে একটু বাড়াবাড়ি হইতেছিল সে পাছে তার সুযোগ গ্রহণ করে শান্তার এই আশঙ্কা হইয়াছে।

আর এই শান্তাকে এতদিন সে দেবীর মতো পূজা করিয়াছে, বাঁচাইয়া চলিয়াছে। সেদিন শান্তা যখন ঘরে আসিয়াছিল দরজায় খিল তুলিয়া দিলে সে কী করিত ? যার দেবীত্ব মিথ্যা, তাকে নারীর আসনে টানিয়া নামাইয়া আনিলে প্রতিবাদের তার কী থাকিত ?

অথচ শান্তার হাতটি ধরিতে তার ভয় হইয়াছে, পাছে অপমান করা হয়, পাছে প্রকাশ্য বুঢ়তায় নেপথ্যের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়।

স্কুল ভালো লাগিল না। বিমল বাহির হইয়া আসিল। গলির দুধারে যে মেয়েগুলি সন্ধ্যা হইতে দাঁড়াইয়া আছে তাদের সম্বন্ধে বিমলের কোনোদিন কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আজ চলিতে চলিতে দু-একটি মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মনে হইল, বাস্তবতা সম্বন্ধে এতদিন তার কোনো

ধারণা ছিল না। সে জানিত, তাদের বাড়ির সেই যুবতি ঝি, মোড়ের দোকানের পানওয়ালি, বাজারেব মেছুনি আর গলির দুদিকের অন্ধকারে কোটরবাসিনী সেই হতভাগিনী এদের জীবনেব বাস্তবতাই নিষ্কলুষ—তাতে খাদ নাই। শান্তার মতো জীবন যাদের নিভৃত, সংযত ও নিরাপদ, জীবনে যাদের অবসর আছে, চিন্তা আছে, কল্পনা আছে, ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ আছে, তাদের বাস্তবতা অন্যরকম। মাটি হইতে তারা শুধু প্রাণপণে রস টানে না, বর্ণ নেয়, গন্ধ নেয়, কোমলতা নেয় এবং সেই বর্ণ, গন্ধ ও কোমলতা ফাঁকি নয়।

কিন্তু আজ সে ধারণা বদলাইবার দিন আসিয়াছে। শান্তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অবাস্তবতার মোহে ঠকিয়া গিয়াছে। কবিতা দিয়া স্তব করিয়াছে মাটির প্রতিমাকে, সংযম দিয়া মর্যাদা রাখিয়াছে ছলনার।

একটা সাংঘাতিক বকমের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিমলের অসাধাবণ তীব্র ইচ্ছা হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল ভিতরে যে একটা ভয়ানক জ্বালা আবস্ত হইয়াছে শান্তাকে না ভাঙিলে সে জ্বালা কিছুতে কমিবে না।

শান্তার সঙ্গে এতদিন সে যে অবাস্তব ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছে এখন তেমনই একটা উগ্র অভদ্রতা করিয়া ফেলা চাই। নইলে জীবনে সে শান্তি পাইবে না।

এবং শান্তাব এমনই কপাল যে আজই তাহাকে বিমলের ঘরে আসিতে হইল। পরশু তাহাদের যাওয়াব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অধর তাহাকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, চব্বিশ ঘণ্টা তার সতর্ক প্রহরায় একবারও শৈথিল্য দেখা যায় নাই। এ বাড়ি ছাড়িয়া এ পাড়া ছাড়িয়া জন্মের মতো চলিয়া যাওয়ার আগে যাওয়ার কথাটা নিজের মুখে বিমলকে সে যে জানাইতে পারিবে এ আশা শান্তাব ছিল না। সন্ধ্যার পব অধর আজ সহসা নিজেকে গুটাইয়া নিয়াছে। তাব কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে তার অনেক রাত্রি হইবে।

অপ্রত্যাশিত সুযোগটা শান্তাকে যেন বিমলের ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিল।

ও বাড়ি গিয়া নীচে প্রমীলার সঙ্গে সে কয়েক মিনিট কথা বলিল। কিন্তু আলাপ তাহাদেব জমিল না। প্রমীলা ভারী ব্যস্ত।

শান্তা বলিল, আচ্ছা তুমি কাজ কর, আমি ততক্ষণ তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কবে আসি ভাই। কবিতার কত নিন্দা করেছি !

প্রমীলা তাহাকে সাবধান কবিয়া বলিল. যাও, কিন্তু সাবধানে কথা বোলো। ভীষণ বেগে আছে।

কার ওপরে ?

কী জানি ! তোমার ওপরেও হতে পারে !

আমার ওপরে রাগতে যাবেন কেন? বলিয়া হাসিযা শান্তা উপরে গেল।

বিমল কেমন করিয়া টের পাইয়াছিল, বলিল, ভেতরে আসুন। এবং শান্তা ঘরে ঢোকা মাত্র সে দরজায় খিল তুলিয়া দিল। বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ওখানে বসুন।

শান্তা নির্ভয়ে বসিল। হাসিয়া বলিল. মারবেন নাকি ? জানেন, আমরা চললাম আপনাদেব পাড়া ছেড়ে।

বিমল জানালার কাছে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, সেই রকমই শুনছি। কিন্তু পালাবার দরকার ছিল না। আপনি অনায়াসে এখানে থাকতে পারতেন,—আমি আপনার ছায়াও মাড়াতাম না।

শান্তা বারণ করিয়া বলিল, জানালাটা বন্ধ করবেন না।

বিমল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আদেশটা যদি না মানি ?

আদেশ দিইনি। জানালা বন্ধ করলে আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে। ঝিকে বলে এসেছি, উনি ফেরামাত্র এই জানালা দিয়ে সে আমাকে ডাকবে। কিছু না বুঝে মাথা গরম করেন কেন ?

স্বামীর সঙ্গে জুয়াচুরির ব্যবস্থা করেছেন ? বেশ বেশ।

বিমল ফিরিয়া আসিল এবং উদ্ধতভাবে শান্তার পাশে বসিয়া পড়িল। দরজায় খিল পড়া অবধি শান্তার বুকের মধ্যে কাঁপিতেছিল, কিন্তু বিমল যে রকম খেপিয়া গিয়াছে, ও সব তুচ্ছ বুক-কাঁপাকে সে গ্রাহ্য করিবে না, কারণ সেটা এক ধরনের অপমান। বিমলের এই উত্তেজিত অবস্থাকে সে ভয় করিতেছে জানিলে ও আরও রাগিবে, আরও উত্তেজিত হইবে, আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে। সে যদি আজ বাঁচিতে চায়, এ পাগলকে বাধা দিয়া বাঁচিতে পারিবে না। সর্বনাশ যদি বিমল আজ তাহাকে দেয়, বিমলের দান বলিয়াই সে আজ মাথা পাতিয়া নিবে, এমনই একটা ভাব সে যদি আগাগোড়া বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, ওর শান্ত হইতে সময় লাগিবে না।

ওর মনের শিশু দুষ্টবৃত্তিকে শান্তা চেনে।

সংকুচিত হওয়ার পরিবর্তে শান্তা তাই বিমলের একটি হাত দুই হাতে মুঠ করিয়া ধরিল, যেন, সে এখন নিরুপায় বটে, কিন্তু নির্ভরতাব তার সীমা নাই। হাসিয়া বলিল, জুয়াচুরি নয়, ছলনা বলতে পারেন। বন্ধুর জন্য এটুকু করতে হয়, তাতে দোষ নেই। ওকি কিছু বুঝবে ? ছাই বুঝবে। যা তা ভাববে। কিন্তু ও অন্যায় করে একটা কথা ভাববে বলেই বন্ধুর কাছে না এসে তো আমি থাকতে পারি না ? তাই একটু ছলনা করে দুদিক বজায় রাখলাম। কী জানেন, এখানে সত্যিকাবের—আন্তরিকতায় তার মুখের হাসি মুছিয়া গেল, কী জানেন, মানুষ মানুষকে বোঝে না বলেই তো বেঁচে থাকা এত কষ্টকর। আপনি আমাকে যেমন বোঝেন, আমি আপনাকে যেমন বুঝি, সকলের সঙ্গেই যদি সে রকম একটা সম্পর্ক থাকত তবে আব ভাবনা কী ছিল !

রীতিমতো বক্তৃতা। কিন্তু শুধু বিমলের নয়, নিজের উন্মাদনাকেও সে জয় করিতেছিল। কথাগুলি বলিবার ভঙ্গিতে তাই আরও অনেক কিছু প্রকাশ হইয়া গেল। আজই শান্তাকে দেহেমনে নিজের করিয়া নেওয়ার যে প্রতিজ্ঞা একটু আগে বিমলের মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতো কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল তার আর তেমন জোর রহিল না।

কিন্তু ওই প্রতিজ্ঞাটি ছাড়াও অনেক প্রতিজ্ঞা বিমলের মনে ছিল। তীব্র চাপা গলায় সে বলিল, বন্ধুটন্ধু নই। আমি আপনাকে ভালোবাসি। লজ্জা শান্তা জয় করিতে পারিল না। তার কথা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মৃদু হইয়া গেল।

আমি বাসি না ?

একটু বলিতে হয়। কাবণ ভালোবাসাটা শুধু একপক্ষের এটা প্রমাণিত হইয়া গেলে অপর পক্ষেব স্বার্থপরতা ও ঠকানোর কথাটা আপনি আসিয়া পড়ে। এবং সে বড়ো হীনতার কথা।

সুতবাং খুবই সংক্ষেপে দুজন প্রায় সমবয়সি নরনারী, যাদেব একজন সংসার সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ যে একেবারে বেহিসাবির মতো ভালোবাসিতে পারে এবং অন্যজন নারীজীবনে চাওয়া-পাওয়া সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই এত বেশি মাথা ঘামাইয়াছে যে নিজেকে এবং নিজের ভালোবাসাকে সর্বদা সংযত রাখার চেষ্টা করে, ইহারা, এই দুজন, পরস্পরের ভালোবাসাকে স্বীকার করিল। প্রেম এমনইভাবে স্বীকৃত হয়। একদিন—অকস্মাৎ—সংক্ষেপে।

একটি নিবিড় আলিঙ্গন, গোটাকয়েক পাগলাটে চুম্বন, এক মিনিটের তীব্র, তীক্ষ্ণ ও বিশ্বাস্য সেন্টিমেন্টালিটি, ইহার উপর দিয়াই শান্তার ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল।

একটু সরিয়া শান্তা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। একটু একটু করিয়া সমস্তই তার মনে পড়িতেছে—স্বামীর কথা, অনিবার্য ভবিষ্যৎ সংসারটির কথা, আজ রাত্রির কথা মনে করিয়া নিশ্চিত আনন্দ ও সুনিশ্চিত যন্ত্রণার কথা, তার সিঁথির সিঁদুর বিমলের কপালে লাগা কেমন করিয়া সম্ভব

হইল নিজের জীবনের এই দুর্ভেদ্য রহস্যের কথা। বিমলকে সে বলিয়াছে ভালোবাসি; বিমলের চুম্বনকে সে ব্যাকুল আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে, তবু যেন এ ব্যাপারকে সে বুঝিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছে, ভালোবাসারও একটা অতিরিক্ত নেশার ঝোঁকে সে এই বিপজ্জনক খেলা শুরু হইতে খেলিব না, খেলিব না বলিতে বলিতে এতদূর পর্যন্ত খেলিয়া আসিয়াছে। স্বামী থাকিতে আর একজনকে পৃথিবীতে সে এই প্রথম ভালোবাসিল না, সংসারে এমন হয়, কিন্তু সে যেন আলাদা ধরনের। পরপুরুষকে যে ভালোবাসে, সে সমস্ত জানিয়া-বুঝিয়াই ভালোবাসে, তার পিপাসায় রহস্য থাকে না, তার আত্মসমর্পণ অকারণ হয় না, তাকে যে জয় করা হইয়াছে এটুকু অন্তত সে বোঝে। কিন্তু বিমল তাকে জয় করে নাই, সে বিমলের অধিকারে আসিয়াছে। কেন আসিয়াছে ?

সে বিমলকে ভালোবাসে নাই, তবু বিমলের জন্য তার ভালোবাসা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ঘরে আসিবারও কামনা তাহার ছিল না তবু এ ঘর ছাড়িয়া যাইতে তার ইচ্ছা হইতেছে না, এই বিছানায় শুইয়া দুটি শ্রান্ত চোখ বুজিবার সাধ হইতেছে। বিমলের বুকের কাছে গুটিসুটি হইয়া সারারাত সে স্বপ্ন দেখিতে চায়।

শান্তা চোখ তুলিয়া নিজের অন্ধকার ঘরের দিকে চাহিল। বাহির হইতে ওই ঘরের দিকে চাহিলে তার ভয় করে কেন? ঘরের ভিতরে তো করে না !

বিমল তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। বলিতে লাগিল, আপনি বুঝতে পারছেন না। এ ছাড়া আর উপায় নেই। আপনি স্বীকার করে যান।

শান্তা বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িল। বলিল, সে হয় না।

বিমল উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

কেন হবে না ? কাল আমি বাড়ি ঠিক করে আসব, আপনি খুব ভোরে সদর দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসবেন। এতে কঠিন কী আছে ?

দরজা খুলে বেরিয়ে আসার কথা নয়। ও সব হয় না।

হয়। এমন সহজ উপায় থাকতে আমরা কষ্ট করব কেন ? এমন নয় যে আমি আপনাকে খেতে দিতে পারব না ! না হয় একটু টানাটানির মধ্যে দিন যাবে।

আমাকে খেতে দিতে পারলেও হয় না।

বিমল তবু ছাড়িল না, শান্তার গৃহত্যাগের সপক্ষে যত যুক্তি, যত আবেদন মাথায় আসিল একধার হইতে বলিয়া গেল। জীবনের নিশ্চিত দুঃখটাকে না ঠেকাইলে চলিবে না। যুক্তি ফুরাইয়া গেলে শিশুর মতো বিমল আবদার আরম্ভ করিল।

তখন শান্তা কাঁদিয়া ফেলিল। শব্দ করিয়া নয়, তার চোখে জল আসিল।

চোখ মুছিয়া বলিল, আপনি কিছু বোঝেন না। ও মোকদ্দমা করবে।

করুক।

কিন্তু এ ঔদ্ধত্যের যে কোনো মানে হয় না বুঝিতে বিমলের সময় লাগিল না। সে খিল খুলিয়া দিল। বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। জীবনে শান্তার সঙ্গে আর দেখা হইবে, এ সত্যের অন্যথা নাই।

ইহার পর আর টানাটানি করিতে গেলে সেটা নিছক নাটকে দাঁড়াইবে।

তবু বিমল বলিতে ছাড়িল না—এর শোধ নেব।

নীচে নামিতে নামিতে প্রমীলা বলিল, কবিতা শোনা হল ?

হল।

সব ?

জীবনে যত কবিতা আছে সব।

তবে আর কী বাড়ি গিয়ে গলায় দড়ি দাও। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা ? ছি ছি ! ও তো রাক্ষসীর কাজ।

অধর বলিল, ছাদে চলো। ঘর থেকে সব দেখেছি। তোমরা আলোতে ছিলে, আমি অন্ধকারে ছিলাম; কিন্তু দেখতে সুবিধা হয়েছে আমার। উঃ, এমন করে মানুষ ঠকে ! মানুষের বুকের পাঁজর এমনই করে হৃৎপিণ্ডে বিঁধে যায় ! স্ত্রীর হাত ধরিয়া অধর ছাদে উঠিয়া গেল।

দুধকলা দিয়ে সাপ পোষার কথা শুনে হাসি পেত। ভাবতাম, মানুষ অত বোকা হয়, পণ্ডিতের এটা বাড়ানো কথা। বুকের ভালোবাসা দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা পয়সার সুখসুবিধা দিয়ে মানুষ যে সাপের চেয়ে ভয়ানক প্রাণীকে পোষে এ কথা কল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু সেটা আমারই কল্পনার লজ্জা। পৃথিবীতে বোকা আছে, আমার মতো বোকা পৃথিবীতে আছে শান্তা। আমিই তার প্রমাণ।

শান্তা একপাশে আলিসায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অধর অস্থিরভাবে, মর্মাহতভাবে তার সামনে ছটফট করিয়া হাঁটিতে লাগিল। সে যেন খেপিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধাবণ অবস্থায় ফিরিয়া আসার জন্যই তাব যেন সবটুকু খ্যাপামি।

তুমি ওদের বাড়ি থেকে ফিরে আসতে, আমি তোমায় আদর কবতাম। তোমাব ঠোঁটে হয়তো বিমলের লালা লেগে থাকত, আমি চুমু দিয়ে তাই মুছে নিতাম—ভাবতাম অমৃত। বিমলের গায়ের তাপ নিয়ে তুমি আসতে আমি ভাবতাম সে তোমার স্বাস্থ্য। কেন তুমি সেইদিন আমাকে জানতে দিলে না যেদিন প্রথম নর্দমা ঘেঁটে এলে ? কেন তোমাকে ছুঁতে দিলে ? জানা মাত্র আমি তোমায় ছুটি দিতাম শান্তা। এই ঘববাড়ি, তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি মেসে গিয়ে থাকতাম। নরকে যদি নামলে তো উঠে এলে কেন ?

সত্যমিথ্যায় জড়ানো এবং আন্তরিকতা ও অভিনয় মেশানো কথাগুলি বিষাক্ত মদের মতো শান্তার শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া দিতে লাগিল। তবু এই অবস্থার, অধরের এমন কবিয়া কথা বলাব কী যেন একটা মোহকরী উপভোগ্য আকর্ষণ আছে। মনে হয জীবনের একটা অদ্ভুত রহস্য এই বিপুল সমারোহেব সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। এ শুধু ভূমিকা। শান্তা নীববে শুনিতে লাগিল।

অথচ আমি তোমায় ভালোবাসি। বাসি না শান্তা ?

শান্তা মিথ্যা বলিবে কেন ? সে স্বীকাব করিয়া বলিল, বাস।

তবে ?

তবে কী ? এমন একটা বাহুল্য প্রশ্ন যে অবস্থাবিশেষে উচ্চারণভেদে এত ভয়ানক শোনায় শান্তা তাহা কল্পনা করিতে পারিত না। সে একবার শিহরিয়া উঠিল।

অধর পায়চারি বন্ধ করিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল, তুমি তো অনায়াসে মরতে পারতে ! এত বড়ো পাপ করার চেয়ে মরাটা কি কঠিন শান্তা ? তোমাকে আমি ভালোবাসি, আমাকে তুমি ধ্বংস করে দিলে। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এমন পাপ করলে যার বাড়া পাপ মেয়েমানুষের নেই—কোনো মানুষের নেই। এ কাজ করার আগে মরে তো তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারতে। মরা কত সহজ। দু মিনিট নিশ্বাস না নিলে—ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে মানুষ মরে যায়। তুমি মরলে না কেন ? চোখ বুজে ছাদ থেকে তুমি উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়লে না কেন ? কীসে তোমার বাধল ? বিমলের বুক থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলার আগে এক মিনিটের জন্য ছাদে এসে তুমি নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে না কী ? কীসে তোমায় আটকে রাখল ? আমি হলে মরতাম শান্তা, অসতী হওয়ার জন্য নয়, একজন নির্দোষ মানুষকে ঠকানোর জন্য আমি মরতাম। কত লোক মদ খায়, স্ত্রীকে মারে, এক মুহূর্তের জন্যও তাকে বিশ্বাস করে না, তারাও তো এমন করে

ঠকে না শান্তা। জগতে কি বিমলের অভাব আছে? কিন্তু স্বামীর লাথি খেয়ে, অবিশ্বাসের অপমান সয়ে তারা বিমলকে ঠেকিয়ে রাখে। না পারলে মরে। তুমি ? তুমি স্বামীর স্নেহ পেয়েছ, সম্মান পেয়েছ, তোমার অবস্থায় জীবন কাটাতে পেলে পৃথিবীর অর্ধেক মেয়ে বর্তে যায়। আব তুমি দিনের পর দিন স্বামী থাকার সুযোগটি এমনিভাবে ব্যবহার করলে ?

অধর থামিল। তবে একেবারে থামিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল কিন্তু এখন থামিয়া গেলে যে দুর্বলতাব প্রশ্রয় দেওযা ছাড়া আর কোনো লাভই হইবে না, এ জ্ঞান অধরেব আছে। শান্তাকে আর বাঁচিতে দেওয়া যায় না, সে অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ওকে এখন জীবন দান করিলে জীবনব্যাপী শাস্তিই দেওয়া হইবে।

এ যে মানুষ পাবে আমি তা ভাবতেও পাবতাম না শান্তা। অভিনয় টের পাওয়া যায়। কিন্তু আমায় তুমি দিনেব পব দিন ভুলিয়ে রেখেছ। তোমাব কথা-হাসি-ব্যবহাবে এতটুকু তাবতম্য আমার চোখে পড়তে দাওনি, আমাকে অন্ধ করে রেখেছ। বিমলের ঘর থেকে সোজা আমার বুকে উঠে আসতে তোমাব এতটুকু ভাবান্তরও হয়নি, ভালোবাসার চোখ দিয়ে আমি যা ধরতে পারি। তুমি অসাধারণ শান্তা, পৃথিবীতে তোমাব তুলনা নেই।

শান্তা নীরবে শুনিতে লাগিল। একান্ত বিহ্বলতার মধ্যেও নিজেকে আবিষ্কাব করিতেছে। অধরেব চারিদিকে যে কুয়াশা ছিল, সেটাও কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিমলকেও শান্তার মনে আছে। ওর শেষ মুহূর্তের সকবুণ ব্যাকুলতাটুকু। কল্পনাতীত মিথ্যার উপব দাঁড়াইয়া ওটুকু সে সৃষ্টি কবিযাছে এবং ওটুকু সত্য।

লণ্ঠনেব যে গাঢ় আলোয শান্তা বিমলের চোখেব উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিযাছিল, কে যেন তেমনই আলো আনিয়া চোখে ঝাপটা মারিতেছে। তবু চোখে অন্ধকার দেখার বিবাম নাই। শান্তা চোখ বুজিল।

আমাকে একটা সত্যকথা বলবে শান্তা ?

কী ?

একদিন এক মুহূর্তের জন্যও তোমার অনুতাপ কী এমন তীব্র হযে উঠতে পারেনি যে, ছাদে এসে উঠোনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পার ?

তুমি কি চাও আমি উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ি ?

তোমার কাছে আমি আব কিছুই চাই না শান্তা।

মাথা নিচু করিয়া অধর ধীরে ধীরে সিঁড়িব মুখেব কাছে আগাইয়া গেল। সেইখানে একটু দাঁড়াইল। তারপব অন্ধকাব সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে আবম্ভ করি ।।

নীচে নামিয়া ঝিকে সদর দরজা বন্ধ কবিতে বলিয়া ও যতক্ষণ না বাড়িব বাহিব হইয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তার অপেক্ষা করিতে হইবে। ওকে জড়াইযা লাভ নাই। লোকে যখন সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিবে, ঝি যেন তখন বলিতে পারে, কই না? বাবু তখন সবে বাইরে গেছেন—আমি দরজা দিলাম, আমি জানিনে ?

অধর সম্বন্ধে শান্তা বিস্ময়কর জ্ঞানলাভ করিয়াছে। বিমলের চেয়েও উগ্রভাবে, অন্ধভাবে ও তাকে ভালোবাসে। বিমলের মাথা খারাপ হয় নাই, কিন্তু অধর পাগল হইয়া গিয়াছে। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও এই সর্বনাশা ভালোবাসার খ॰' সে পায় নাই। কিন্তু সেটা বিশেষ আশ্চর্যেব কথা বলিয়া শান্তার মনে হইল না। সে সাধারণ মেয়ে, এ রকম সাংঘাতিক প্রেমেব খবর রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা তাহার বুদ্ধি ও অনুভূতির সীমার বাইরে, তাহাকে সে আয়ত্ত করিতে পারিবে কেন? আজিকার মতো অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া না পড়িলে ও জিনিসকে সে কোনোদিন বুঝিতে পারিত না। গুমোটের মধ্যে কালবৈশাখীকে আবিষ্কার করার দৃষ্টি তাহার ছিল না, ঝড় না ওঠা পর্যন্ত গুমোটের মানে সে বুঝিতে পারিত না।

অধর আজ যে ব্যবস্থা করিয়া গেল, সে জন্য তাকে শান্তা দোষ দেয় না। ওর কাছে সে পুতুল হইয়াছিল বইকী। পুতুল নিয়া অমন উন্মত্ত প্রেমিকের চলে না। অথচ ফেলিয়া দেওয়ারও উপায় নাই। তাকে অধর ত্যাগ করিতে পারিত না, মামার কাছে পাঠাইয়া দিলে চলিত না। যে পুতুল সাড়া দেয় না, তাকে নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলা ছাড়া অধরের আর কী উপায় ছিল ?

উঠানটা অল্প অল্প আলোকিত, ঝিকে ডাকিয়া অধর উঠানে একটু দাঁড়াইল, কিন্তু উপরের দিকে চাহিল না। ঝি আসিলে সে বাহিরের দিকে পা বাড়াইল, তখনও একবার ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল না। দরজা বন্ধ করিয়া ঝি ফিরিয়া আসিল।

মাথায় অতিরিক্ত রক্ত উঠিয়া গেলে চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটিয়া থাকে, ভালো করিয়া কিছু দেখা যায় না। তবু শান্তা একবার চারিদিকটা দেখিবার চেষ্টা করিল। এবং তারপর কল্পনায় বিমলের বুকে নিজেকে সঁপিয়া দেওযার মতো আলিসার ওদিকে নিজেকে সে শান্তভাবে সঁপিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমল খবব পাইল পরদিন বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগের পব। খবব দিল প্রমীলা। একটু খাপছাড়া ভাবে।

তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার পর শান্তা একটা বিশ্রী কীর্তি করেছে দাদা. ছাদে উঠে উঠোনে লাফিয়ে পড়েছে।

বিমল রুদ্ধশ্বাসে বলিল, কখন ?

প্রমীলার জবাবটা মারাত্মক। শান্তা যে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে, খবর যেন শুধু এই কারণেই অসাধারণ যে, ও কাজটা সে বিমলের ঘর হইতে বাহির হওয়ার পরেই কবিয়াছে। অন্য সময় শান্তা এ কীর্তি কবিলে প্রমীলার কিছু আসিয়া যাইত না।

এত বড়ো বোনকে আঘাত করিবার ইচ্ছা চাপিয়া বিমল বলিল, কী হয়েছে ? মবে গেছে ?

না, এখনও মরেনি। বোধ হয় মববে। মাথা ফেটে গেছে, বাঁ হাতটা দু জাযগায় ভেঙেছে, কোমর মচকে গেছে—আরও যেন কী কী হযেছে শুনলাম।

শুনলি ? তুই দেখতে যাসনি ?

না।

কেন ?

কী হবে দেখতে গিয়ে? আমি কিছু করতে পারব? কাল যে ভালো মানুষটার সঙ্গে কথা বলেছি তার ভাঙাচোরা শরীরটা দেখবাব কৌতূহল আমার নেই দাদা। আমি পুরুষ নই, আমার—

প্রমীলা কাঁদিতে গিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল।

বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। শান্তা জর্দা দেওয়া পান খায়, খানিক আগেও বিমলের ঠোঁটে যে জর্দার স্বাদ ও গন্ধ লাগিয়াছিল। শুষ্ক ঠোঁটে জিভ বুলাইয়া আনিয়া বিমলের সমস্ত মুখ তিতো হইয়া গেল। এক মিনিটে সে তিনদিন জ্বর ভোগ করিয়া উঠিয়াছে।

আচ্ছা, তুই যা মিলি।

যাই। আজ সারাদিন আমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম সেটা বলে যাই। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে শান্তা যেন তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যায়।

প্রমীলা চলিয়া গেলে বিমল জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শান্তার জানালা বন্ধ, কান পাতিয়া কোনো শব্দ শোনা যায় না। ঘরের ভিতরের ছবিটি বিমলের মনে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ঘরের ভিতরে অনেকগুলি ছবি সে দেখিতে পায়, এককোণে ছোটো আলনাটিতে শান্তার শাড়ি আর শেমিজ

সাজানো রহিয়াছে, ওদিকের দেয়াল ঘেঁষিয়া বসানো আলমারিটি কাচের পুতুল আর নানারকম শৌখিন জিনিসে বোঝাই, একটা তাকে শান্তার সেলাই-এর সরঞ্জাম। ওইখান হইতে বুনিবার কাঁটা আর উল বাহির করিয়া শান্তা জানালায় বসিত, দরকার শেষ হইলে আবার ওইখানে রাখিয়া দিত। কী বুনিতেছিল কে জানে ! তার অসম্পূর্ণ শিল্পপ্রচেষ্টাটি বিমল আলমারির তাকে দেখিতে পায়, কিন্তু চিনিতে পারে না। ভিতরের বারান্দার দিকে একটি খোলা জানালা, তারই আলোতে শান্তার সাদাসিধে ড্রেসিং টেবিলটি পাতা আছে—আয়নার তলার দিকটা সিঁদুরের গুঁড়ায় লাল।

এদিকে শান্তার খাট, জানালা খোলা থাকিলেও চোখে পড়ে না। পাঁচ-ছয়টা বালিশের আশ্রয়ে নিস্পন্দ শান্তা শুইয়া আছে, তার লজ্জা নিবারিত হইয়াছে ব্যান্ডেজে। শান্তার চোখের পাতারও মৃদুতম কম্পন নাই, সে এমন শান্ত।

খাটের বাজুতে একটি চওড়া লালপাড় শাড়ি। ওখানে শাড়িটি কী করিয়া আসিল বিমল তাহা জানে। কাল তাড়াতাড়ি ওই কাপড়টি বদলাইয়া শান্তা তার ঘরে আসিয়াছিল।

অধরকে বিমল কিছুতেই ও ঘরে মানাইতে পারিল না। একটা অশরীরী উপদেবতার মতো সে ও ঘরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমল জানালার কাছে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনো শব্দ তার কানে আসিল না। শুধু বোঝা গেল অন্ধকার হইয়া আসিলে ঘরে কে মৃদু নীল আলো জ্বালিয়াছে।

তখন বিমল খবর নিতে গেল।

দরজা খুলিয়া দিল ঝি। ঝির নাম বিন্দু।

বিন্দু বলিল, একটু দাঁড়ান বাবু, বাবুকে ডেকে আনি।

বিমলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া বিন্দু অধরকে ডাকিতে গেল। বিমল পথে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে বিন্দু নামিয়া আসিল।

বাবু আসতে পারবেন না, ব্যস্ত আছেন।

বিমল রুদ্ধ নিশ্বাসে শান্তার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বিন্দু বলিল, ভালো আছেন। বিমলের আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, কিন্তু সে সুযোগ পাইল না। বিন্দুর প্রতি অনেকগুলি নিষেধ জারি করা হইয়াছিল। বিমল দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিবার আগেই দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

বিমল বাড়ি ফিরিল না, গলির মোড়ে চায়ের দোকানে এক কাপ চা খাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। এখানে চেনা লোক আসে। পাড়ার লোকেরা শান্তার কথা তোলে। ইতিমধ্যে কথাটা ছড়াইয়া গিয়াছে।

কারণটা নিয়া গবেষণা হয়। কেউ বলে আত্মহত্যা, কেউ বলে খুন, অ্যাকসিডেন্টের কথা যে বলে সে একেবারে পাত্তাই পায় না। দায়ি সাব্যস্ত হয় অধর। হয় সে নিজে করিয়াছে, না হয় তার অত্যাচার সহিতে না পারিয়া বেচারি বউটি নিজে—

একজন বলিল, বেচারি বোলো না হে, ভেতরের কথা কে জানে? হয়তো কারও সঙ্গে শ্রীমতী কোনো কীর্তি করেছিলেন, শেষে ধরা পড়ে—

পথে নামিয়া যাওয়ায় শেষটা বিমল শুনিতে পাইল না। ওদের সে দোষ দিল না। ওদের মতো সেও যদি তৃতীয় ব্যক্তি হইত, এমনিভাবে শান্তাকে নিয়া আলোচনা করিতে তার বাধিত না।

কিন্তু শান্তা যা করিয়াছে সে কী কীর্তি ?

এ জীবনে সে আর কোনো নারীর কীর্তিতে বিশ্বাস করিবে না।

কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন সে কী করিবে ? কোথায় যাওয়া যায় ? মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না, নির্জনতার কথা ভাবিতেও অসহ্য বোধ হয়। কী করিবে সে ? মদ খাইবে ?

নিজের মনে সে মাথা নাড়িল। শান্তার আত্মহত্যা মদে ডুবিবে না, তাছাড়া ভালো অবস্থাতে যদি মদ খাওয়া অন্যায় হয়, শান্তার অজুহাতে মদ খাওয়া অপরাধে দাঁড়াইবে। শান্তাকে সে ভালোবাসে, তার জন্য শান্তা যদি এ কাজ করিয়া থাকে, নিজের অনুভূতিকে সে রেহাই দিবে না। মদ কেন, বিষ খাইলে তো মাথা ধরা একেবারে ঠান্ডা হইয়া যায়—কিন্তু বিষ খাওয়ার অধিকার তাহার কোথায় ?

বাড়ি ফিরিয়া শান্তার রুদ্ধ বাতায়নটিকে সে পাহারা দিবে। ওদিকে চাহিয়া তার বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যাইবে। মদ খাওয়ার চেয়ে, বিষ খাওয়ার চেয়ে সে হইবে আরও বড়ো নেশা, আরও গভীর বিস্মৃতি।

অনেক রাত্রে, বোধ হয় বারোটার পর, শান্তা আসিয়া জানালা খুলিয়া এবং কয়েকটি অস্ফুট কাতরানির শব্দ করিয়া মুহ্যমানের মতো ঠেস দিয়া জানালায় বসিয়া রহিল।

বিমলের মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কী আবির্ভাব ! ঘুমের চাদরে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আকাশের চাঁদের আলো শান্তার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে রহস্যময় নিষ্প্রভ নীল আলো। মাথায় তাব ব্যান্ডেজের ঘোমটা, মুখের সবটা চোখে পড়ে না। বাঁ হাতটি গলায় বাঁধা থলিতে ঝোলানো। কাপড়ের এমন অসংযম যে দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় সে ঢুলুঢুলু চোখ দুটি খুলিয়া রাখিয়াছে। কী দেখিবার কামনা ও চোখের কে জানে !

বিমল মৃদু অস্ফুট স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিল।

শান্তা বলিল, কী ?

এমন করলে কেন শান্তা ? এ প্রবৃত্তি তোমায় কে দিয়েছে ?

শান্তা মুহূর্তে অভিমান করিয়া বলিল, বকছ কেন, আমি কী করেছি !

বিমল কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। ভয়ে আর দুর্ভাবনায় উত্তেজনা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শান্তাও চুপ করিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমল বলিল, খুব কষ্ট হচ্ছে শান্তা ?

না গো না, কষ্ট কীসের ? তোমার কাছে আসবার জন্যেই তো ছটফট করেছিলাম—আমাকে আসতে দেয় না। যা খুশি কর না তুমি, আমার কষ্ট হবে কেন? বলিয়া চাঁদের আলোয় সে একটু হাসিল, আমার শুধু লজ্জা করছে। মিলি কী ভাববে ?

কিছু ভাববে না শান্তা। তুমি শুয়ে থাকবে যাও।

যাই। কিন্তু মিলি নিশ্চয় যা তা ভাববে। ও কী জানে বল? আমাকে ও রাক্ষসী ভাববে, মনে করবে মানুষের জীবন নিয়ে আমি খেলা করি। আমি কিন্তু খেলা করিনি। করেছি ?

না। মিলি তোমাকে ও সব কথা বলেছে বুঝি ?

কই না। বলেনি। যদি বলে ?

বলবে না। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুয়ে থাকো শান্তা। বুঝতে পেরেছ ?

পেরেছি।

কী বুঝেছ ?

গিয়ে শুয়ে থাকব, এই তো ?

হ্যাঁ, যাও।

শান্তার কথা কান্নায় জড়াইয়া গেল—তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? আমি কী করেছি? আমি বাড়ি যাব না—তোমার কাছে থাকব। তাড়িয়ে দিয়ো না আমায়—বাড়ি যাব না, যেতে পারব না।

বিমল বলিল, অমন কোরো না শান্তা, আমার কান্না আসছে।

শান্তা সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিমল বলিল, তোমায় আমি তাড়িয়ে দেব কেন ? মাথা কি তোমার খারাপ হয়ে গেছে শান্তা ? আমার মনের ইচ্ছাটা তুমি কী বুঝতে পারছ না ? তোমায় আমি যেতে বলিনি তো। বলেছি খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই আমি গিয়ে তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে আসব।

শান্তা থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুমু দেবে ?

দেব। অনেক চুমু দেব।

আমি রাক্ষসী নই ?

না। তুমি লক্ষ্মী।

মিলি আমায় বকবে না ?

না বকবে না। কখন তুমি শোবে শান্তা? কখন কপালে হাত বুলোব ?

যাচ্ছি গো, যাচ্ছি।

শান্তা উঠিল এবং খাটের দিকে পা বাড়াইয়াই ঢলিয়া পড়িয়া গেল। শব্দও করিল না, উঠিবার চেষ্টাও করিল না।

বিমল পাগলের মতো অধর আর ঝিকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। অধর যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিয়াছিল এমনইভাবে নিঃশব্দ ছায়ার মতো সে খোলা জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিল্লিয়ে পাড়া মাত কোরো না।

বলিয়া সে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। বিমল দেখিতে পাইল না কী অপরিসীম যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কত যত্নে শান্তার অচেতন দেহটা সে বুকে করিয়া খাটে তুলিয়া দিতেছে।

বিমল দুই হাতে জানালার শিক চাপিয়া ধরিয়াছিল, হাত সরাইতে গিয়া হঠাৎ সে মুঠ খুলিতে পারিল না। এত জোরে সে লোহার শিকে আঙুল জড়াইয়া ছিল যে গাঁটগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দিন চারেক কাটিয়াছে।

সকাল বেলাটা বিমল অধরের বাড়ির সামনে ছটফট করিয়া বেড়ায়। অধর বাহিরে আসিলে বাঘের মতো হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে।

প্রথম দিন অধরকে শান্তার খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

উনি কেমন আছেন, অধরবাবু ?

অধর বলিয়াছিল, বিমল, আমার সংযমের একটা সীমা আছে। বাড়িতে একটা গুলিভরা রিভলভারও আছে। মানুষের জীবনমৃত্যুর কোনো দামও আমার কাছে নেই—আমার নিজেরও না। অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে কেন নিজের প্রাণটা হারাবে—আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে? তোমাকে আমি অন্য শাস্তি দিতে চাই—আমার সে সাধে বাদ সেধো না।

আরও শাস্তি? বিমলের ইচ্ছা হইয়াছিল অধরের মুখের উপরে হাসিয়া উঠে, বলে ধন্যবাদ ! আমার তবে এখানে আশা করার কিছু রইল ! কিন্তু সে হাসিতেও পারে নাই, কিছু বলিতেও পারে নাই।

অগত্যা বিন্দু ঝির কাছে বিমল খবর জিজ্ঞাসা করে। খবর আর কী, রাত্রে জ্বর খুব বাড়ে, দিনে একটু কম থাকে, কেষ্ট ডাক্তার একবার করিয়া দেখিয়া যায়, বাঁচিবে বলিয়াই ভরসা করা চলে।

ভালো সেবা হচ্ছে তো ঝি ?

আমাকে বিন্দু বলবেন বাবু।

ভালো সেবা হচ্ছে তো বিন্দু ?

হচ্ছে বইকী বাবু।

কে সেবা করছে ?

বাবু করছেন, আমি করছি—

বাবু সেবা করেন ?

মিথ্যা বলব না, পুরুষ মানুষ যতটা পারেন, তা তিনি করেন।

তারপর বিন্দু পালটা প্রশ্ন করে, আপনি এত খোঁজখবর নেন কেন বলুন তো ?

এমনি। এই টাকা দুটো নাও বিন্দু, জলটল খেয়ো।

বিন্দু হাত পাতিয়া টাকা নেয়। বিমল বলে, ভালো করে সেবা কোরো, গিন্নিমা সেরে উঠলে তোমায় আমি পুরস্কার দেব—তোমায় খুশি করে দেব বিন্দু।

বিন্দু একটু হাসে। এত দরদ ! বলে, সাধ্যমতো করব বইকী—আমার তো মানুষের প্রাণ ! বলতে হবে কেন !

বিমল ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বিন্দু, তুমি ঠিক জান সেদিন ঝগড়া বিবাদ হয়নি ?

বিন্দু একটু ভাবে।

না বাবু। একটা উঁচু কথা শুনিনি। বাবু কাপড়জামা পরে বেরিয়ে যাবার পর গিন্নিমা হুড়মুড় করে ছাত থেকে পড়লেন। ভগবান জানেন, আঁধার ছাতে সেদিন কার আসা হয়েছিল !

মানে ভূত। কীর্তিটা ভৌতিক, বিন্দুর এ রকম সন্দেহ আছে।

কেষ্ট ডাক্তারের কাছে গেলে ভালো খবর পাওয়া যায়, কিন্তু যাওয়ার সাহস বিমলের হয় না। সে যদি বলে বাঁচিবে না, বাঁচিবার আশা কম ?

রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে দেয়াল ধরিয়া হামা দিয়া মেঝেতে গড়াইয়া নিজেকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া জানালায় উপস্থিত হয়। না গিয়া তার উপায় নাই। জানালাটা তাহাকে অনিবার্য শক্তিতে টানিয়া নিয়া যায়। কোনো সার্থকতার লোভে নয়, কোনো ব্যথা বিস্মৃতির জন্য নয়, তার বহু অভিনীত অভিসারের পুনরভিনয়ের জন্য প্রতি রাত্রে ওখানে তাহাকে যাইতেই হয়।

কেন যায় সে জানে না, জানিয়া-বুঝিয়া সে যায় না। সে শুধু যায়।

নিজের জানালায় দাঁড়াইয়া বিমলের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা হয়, শিকে জড়ানো আঙুলের গাঁটগুলি এক মুহূর্তে সাদা হইয়া যায়।

কিন্তু সে কৌশল করে।

বলে, আমার অসুখ করেছে শান্তা।

ওমা, অসুখ কেন ? ওষুধ খেয়ো।

সারাদিন শান্তা আর কারও কথা বুঝতে পারে না, ডাকিলে শুধু সাড়া দেয়, কিন্তু কথা বলে না। তাহার বিকারগ্রস্ত মন শুধু বিমলের কথার কিছু কিছু অর্থ বুঝিতে পারে।

বিমল বলে, আমার ভারী অসুখ করেছে শান্তা—আমি দাঁড়াতে পারছি না। ভয়ানক অসুখ করেছে বলে আমার এখানে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ ? আমার অসুখ হয়েছে—ভয়ানক অসুখ হয়েছে—এত অসুখ হয়েছে যে, দাঁড়াতে মাথা ঘুরছে। তুমি শোবে যাও শান্তা, আমি ঘুমোব। বুঝতে পারছ কী বললাম ? তুমি শোবে যাও—আমি ঘুমোব। শোনো, আমার অসুখ করেছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না, তুমি শুতে যাও, আমি ঘুমোব। অসুখ সেরে গেলে তোমায় ডাকব। আমি না ডাকলে তুমি কিন্তু জানালায় এসো না শান্তা। বিছানা ছেড়ে উঠো না। বলো, উঠবে না ? আমি না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে ?

এমনিভাবে একই কথা বারংবার আবৃত্তি করিয়া সে শান্তাকে বোঝায়। শান্তা ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে। বিমলের কথার অন্য অর্থ করিয়া কাঁদে, বিমলকে কাছে, আরও কাছে আসিবার জন্য মিনতি করে। শেষে ধীরে ধীরে সে বিমলের কথা বুঝিতে পারে। দেয়াল ধরিয়া হামা দিয়া মেঝেতে গড়াইয়া সে খাটের কাছে সরিয়া যায়, তখন আর বিকারের জন্য তার যে অস্বাভাবিক জ্ঞানটুকু আসিয়াছিল, সেটুকু অবশিষ্ট থাকে না। খাটে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া সে মেঝেতেই শুইয়া পড়িতে চায়। কে তাহাকে সযত্নে বিছানায় উঠাইয়া দেয়, সে তাহা জানিতেও পারে না।

বালিশের আশ্রয়গুলি ঠিক করিয়া দিয়া অধর জানালা বন্ধ করিতে আসে।

বিমল কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলে, অধরবাবু, আপনার কি দয়ামায়া নেই, আপনি কি মানুষ নন ? কী বলে আপনি ওঁকে উঠে আসতে দেন ?

অধর সংক্ষেপে বলে, গায়ের জোরে আমি কখনও আটকাইনি। ও যদি উঠে আসে আমি কী করব ?

এ কী আপনার নিজের কথা ভাববার সময় ?

আবোল-তাবোল বকো না। ওষুধ খেতে না চাইলে জোর করে ওষুধ খাওয়াই, মাথাব ব্যান্ডেজ খুলে ফেলতে চাইলে বাধা দি। আমার যতটুকু কবাব অধিকার আছে, আমি তা করি।

সে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।

পরদি: বিমল অন্য কৌশল কবে।

আমি কাল বাইরে যাব শান্তা, সাত-আটদিন আসব না। শুনছ ? আমি কাল চলে যাব, কাশী চলে যাব। সাত-আটদিন আসব না। বুঝতে পারলে ?

কোথায় যাবে?

কাশী যাব।

কেন যাবে?

বেড়াতে যাব। সাত-আটদিন আমি থাকব না শান্তা। তুমি জানালায় এসো না। আমি না থাকলে তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে কেন ? বুঝতে পাবছ ? আমি থাকব না। তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে না। ফিবে এসে আমি তোমায় ডাকব।

আস্তে আস্তে কথাগুলি সে বহুবার আবৃত্তি করে।

আমি কার কাছে থাকব ? বলিয়া শান্তা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

মাঝখানে ব্যবধান শুধু দু সারি শিকের। এ ঘরের আলো ও ঘরে যাইতে পারে, এ ঘরের বাতাস ও ঘরে বহিতে জানে। বিমল হাত উঁচু করিলে হাতের ছায়া শান্তাকে ছুঁইতে পারে। তবু মাঝখানে দু সারি শিকের ব্যবধান।

দুটি শিকের মাঝখানে বিমল জোরে মাথা গুঁজিয়া দেয়। শান্তার কান্না থামাইতে তার অনেক সময় যায়। তারপর আবার সে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে।

শেষে শান্তা বোঝে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, বিমল ফিরিয়া না আসিলে, নাম ধরিয়া তাহাকে না ডাকিলে, সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবে না।

কিন্তু পরদিন তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে না, আরও দুর্বল আরও শক্ত দেহটা সে জানালায় টানিয়া আনে।

পরমাত্মীয়ের দেহে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের মতো বিমল তখন শেষ চেষ্টা করিয়া দ্যাখে।

রুক্ষ কঠোর স্বরে বলে, কী চাও তুমি, কেন জানালায় এসেছ ?

শান্তা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলে, বকছ কেন ?

বকব না? কেন তুমি আমাকে বিরক্ত কর ?

শান্তা কাঁদিয়া বলে, কী বিরক্ত করেছি ?

বিমল বলে, কী বিরক্ত করেছি ! তোমার লজ্জা করে না জানালায় আসতে ? অবাধ্য কোথাকার—বলিয়া সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু পরদিন জানালার ফাঁক দিয়া সে হতাশ হইয়া চাহিয়া দ্যাখে। ভালো হাতটি দিয়া জানালার শিক ধরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টায শান্তা হাঁপাইতেছে। কোনো বাধানিষেধের কথা সে জানে না, বিমলের বারণ, দেহের যাতনা কিছুই তাহাকে বিছানায় ধরিয়া রাখিতে পাবে না। কোন যুক্তি কোন কৌশলে বিকারগ্রস্তার এ অন্ধ আবেগ বিমল ঠেকাইয়া রাখিবে? কোন বিরুদ্ধ প্রেরণা দিয়া সে শান্তার বিবেচনাহীন প্রেরণাকে প্রতিহত করিবে ?

জানালা খুলিয়া বিমল সহসা এক বুদ্ধি খুঁজিয়া পায়। অনেক কৌশলে, অনেক পরিশ্রমে শান্তার মামার নাম ও ঠিকানাটি সে বাহির করিয়া নেয়। আজ আর শান্তাব ফিরিযা যাওয়াব ক্ষমতা থাকে না, অধর তাহার অচেতন দেহটা জানালা হইতেই তুলিয়া নিযা যায়।

সকালে শান্তার মামার কাছে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আসিয়াও নিজেকে বাববার মূর্খ বলিযা অভিহিত করিল। যে আত্মীয়স্বজন আছে এবং খবর পাইলে তারা যে ছুটিযা আসিবে এ কথাটা তার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। শান্তার বিপজ্জনক বাতায়ন-অভিসার বন্ধ করিতে সম্ভব-অসম্ভব কত কৌশলই সে করিয়াছে ! অথচ এই সহজ উপায়টির কথা তার মনে হয় নাই।

ক-রাত্রি এ রকম জাগিয়া কাটিয়াছে, দুপুরে বিমল ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইযা সে স্বপ্ন দেখিল যে শান্তা ভালো হইয়া গিযাছে এবং যে ভয়ানক শাস্তি সে ভোগ কবিয়াছে, সেটা ব্যর্থ হয নাই। শান্তা সেই সন্ধ্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, বাতায়ন-অভিসারের স্মৃতি তার মনে এত অস্পষ্ট যে এ জন্মে ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ হইতেছে এবং বিমলক সে আর ভালোবাসে না।

ঘুম ভাঙিবার পর বিমল চোখ মেলিল না, পাশ ফিরিয়া স্বপ্নেব তৃপ্তিটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। স্বপ্নটা ঠিক স্বপ্নের মতো যুক্তিহীন নয়। এমন একটা মানসিক বিপর্যয়েব পর শান্তা তাহাব দুদিনের ভালোবাসার ইতিহাসটুকু ভুলিয়া যাইতে পারে বইকী ! ওব মন একেবাবে বদলাইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। ভবিষ্যৎ স্থায়ী শান্তির জন্য শান্তার এমনই একটা ভয়ংকব দুর্ভোগের যে প্রয়োজন ছিল, এ চিন্তায় বিমল ভারী একটা সান্ত্বনা পাইল।

প্রমীলা কী একটা কলম খুঁজিতে ঘরে আসিয়াছিল, গোপনে নগেনকে একখানা পত্র লিখিবে। স্টেশনে সেদিন সে যাহাই বলিয়া গিয়া থাক, তখনকার মতো তাই নিয়া খুশি হইলেও পরে প্রমীলা ভাবিয়া দেখিয়াছে এ ভাবে সে থাকিতে পারে না। থাকা উচিত নয়। এ ভাবে নগেন তাকে রাখিতে পারে না, সে অধিকার নগেনের নাই। সে গরিব গৃহস্থের মেয়ে, তাব কাছে অতখানি আধুনিকতা আশা করাই নগেনের অন্যায় হইয়াছে। সে বিবাহ বোঝে, সংসার বোঝে, নগেনের মুখ চাহিয়াও জীবনে আর কোনো অসাধারণত্বকে সে প্রশ্রয় দিবে না। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে।

বিমল চোখ মেলিয়া বলিল, কী রে মিলি ?

তোমার কলমটা নিতে এলাম। দেবে না ?

নে, নিব ভাঙিস না। তোর চোখের নীচে কালি পড়েছে মিলি। তোর রং এমন বিশ্রী ফরসা যে মনে হচ্ছে চোখে দোয়াতের কালি লাগিয়েছিস।

কাল ঘুমোতে পারিনি।

আমি চার রাত ঘুমোইনি। বোস না, তোর সাথে একটু গল্প করি।

প্রমীলা বসিল। বলিল, রাতদুপুরে বারান্দায় দুমদাম পা ফেলে হাঁটো কেন বল তো ? মা-বাবা দুজনেই টের পেয়েছিল। সকালে কত পরামর্শ হল।

কীসের পরামর্শ রে ?

তোমার একটি বউ আনবার।

যা, বউ ! ছেলে রাতদুপুরে বারান্দায় পায়চারি করলে বুঝি বউ আনতে হয় ?

সাধারণ ছেলেদের জন্য তাই ব্যবস্থা। প্রমীলা গম্ভীর হইয়া গেল। ব্যবস্থাটা ভালো দাদা। যে ছেলে পড়াশুনা করে তারপর চাকরি করে তারপর বিয়ে করে—

তারা জীবনে সুখী হয়। সুখটা সত্যি সুপ্রাপ্য মিলি। বোধ হয় সেই জন্যই কারও কারও সুখে মন ওঠে না।

দুঃখ চায়।

এবং রাশি রাশি পায়।

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, দুঃখটাও তো তা হলে সুপ্রাপ্য দাদা !

তা নয়। সহজে এলে কী হবে, অনেক দাম দিতে হয়।

প্রমীলা একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু যাই বল, দুঃখের মধ্যে কেমন যেন যুক্তি নেই। এ যেন নিজের ঘরে আগুন দিয়ে মজা দেখা। তা ছাড়া আগুনটা ছড়ায়— পরেও দু-চারটে বাড়ি পোড়ে। একা একা কেউ দুঃখ পেতে পারে না, ওর মধ্যে দু-চারজন জড়িয়ে থাকবেই—কী দাদা ?

বিমল জানালায় ছুটিয়া গেল।

অধরবাবু ! অধরবাবু ! ঝি, ও ঝি !

বিমলের পাশে দাঁড়াইয়া প্রমীলা চাহিয়া দেখিল, ও বাড়ির জানালায় ডানাভাঙা পাখির মতো ঘাড় গুঁজিয়া শান্তা পড়িয়া আছে। সে নিশ্চল, সে নিস্পন্দ, ভয়াবহ তাহার সেই অস্বাভাবিক অবস্থান। মাথার ব্যান্ডেজটা রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।

অধর আজ কোনো মন্তব্য করিল না। বিমলের পাশে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে শুধু এই জন্য নয়, শান্তার দিকে তাকানো মাত্র বোঝা যাইতেছিল সে মরিয়া গিয়াছে।

তবু অধর একবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

প্রমীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, কী দেখলেন ?

অধর মাথা নাড়িয়া বলিল, নেই। শেষ হয়ে গেছে।

বিমল কাতরাইয়া উঠিল, অধরবাবু, আপনার পায়ে পড়ি অমন করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ওকে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, একজন ডাক্তার ডাকুন। এখনও হয়তো প্রাণ আছে।

অধর শান্ত স্বরে বলিল, এসো, নিজেই দেখে যাও। শান্তা নেই বিমল, সে স্বর্গে চলে গেছে।

তবু একজন ডাক্তারকে আপনি ডেকে পাঠান অধরবাবু।

বেশ, পাঠাচ্ছি ডেকে। কিন্তু তুমিও একবার নিজে দেখে যাও।

অধর আস্তে আস্তে জানালার পাটটি ভেজাইয়া দিল এবং ঘরের মাঝখানে সরিয়া যাইতে গিয়া অন্ধের মতো দুই হাত সামনে বাড়াইয়া হঠাৎ সে শান্তার দেহের পাশে পড়িয়া গেল। তার দুই হাতের আঙুলগুলি শক্ত মেঝেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নিষ্ফল আঁচড় দিতে লাগিল। এবং দেখিতে দেখিতে চার পাঁচটা আঙুলের ডগা দিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ঘরের বাহিরে বিন্দুর পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্র সে তীরবেগে উঠিয়া বসিল, বলিল, সব কষ্ট শেষ হয়েছে বিন্দু। ভগবান মুক্তি দিয়েছেন। রাখালবাবুকে খবর দিয়ে আয় তো।

বিনা বাক্যব্যয়ে মড়াকান্না আরম্ভ করিয়া দিয়া বিন্দু বাহির হইয়া গেল।

অধর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বিমল বলিল, তা হলে সত্যি শেষ হয়ে গেছে ! বলিয়া সে জানালাতেই বসিয়া পড়িতে যাইতেছিল, প্রমীলা তার হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

ছুটে যাও দাদা, ছুটে যাও—দেখে এসো। কথা কয়ো না কথা কইবার সময় নাই, যাও।

বিমল এক মুহূর্ত নড়িতে পারিল না, প্রমীলা রক্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিল গভীর রাত্রে। শান্তা যে সময়ে জানালায় আসিত সেই সময়।

প্রমীলা নীচে জাগিয়া বসিয়াছিল, বলিল, কলতলায় কাপড় রেখেছি; স্নান করে আর কাজ নেই, কাপড়টা ছেড়ে ফেলো শুধু।

কেন, কাপড় ছাড়ব কেন ?

শ্মশান ? শ্মশানে আমি যাইনি। গেলেও কাপড় ছাড়তাম না। এক গ্লাস জল দে। জল আনিয়া প্রমীলা দেখিল বিমল হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া স্নান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া জামা হাতে করিয়া বিমল উপরে গেল।

জলের গ্লাস তাহার হাতে দিয়া প্রমীলা বলিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

গড়ের মাঠে শুয়েছিলাম। একটা কথা আমায় বলতে পারিস মিলি? রাত্রে শান্তাকে নিয়ে গেলে রাত্রে আর ফেরা যাবে না বলে তাড়াহুড়ো করে দিনে দিনেই ওকে নিয়ে গেল কেন ?

ও রকম নিয়ম আছে একটা।

ও রকম নিয়ম হল কেন ? রাত্রে সকলের ঘুম পাবে, ভালো করে না পুড়িয়ে ফিরে আসবে, এই ভয়ে ?

না সে জন্য নয়। নিয়মটা শুধু রাত্রির জন্য নয়। দিনে নিয়ে গেলে দিনেও ফিরতে নেই।

অদ্ভুত তো ! একটা কিছু মানে নিশ্চয় আছে। আচ্ছা, ধর এমন তো হতে পারে যে, আলোতে যে যায় অন্ধকারে সে ফিরতে পারে না ?

প্রমীলা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। অমন ভয়ে ভয়ে ঘরের চারিদিকে বিমল তাকায় কেন !

বিমল শুইয়া পড়িয়াছিল, প্রমীলা বলিল, কে ফিরতে পারে না দাদা ?

বিমল খানিক চোখ বুজিয়া থাকিয়া বলিল, আলো কটা আজ আর নিভিয়ে কাজ নেই মিলি—জ্বলুক।

আচ্ছা।

তোকে বলতে দোষ নেই, অন্ধকারে ঘুম আসবে না।

আমি বসছি—তুমি ঘুমোও।

ঘুমটুম আমার আর কোনোদিন হবে না।

অথচ চার-পাঁচদিন পড়িয়া পড়িয়া সে শুধু ঘুমাইল। এমন আশ্চর্য ঘুম প্রমীলা জন্মে দ্যাখে নাই। প্রমথ নিজে চার টাকা ভিজিট দিয়া পাড়ার একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়া আসিলেন, বিমলের জাগিয়াও ঝিমানোর সময়ে একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখাইয়া আপিসে পাঠাইয়া দিলেন। আঁতুড়ে অনুরূপা শিশুটিকে বাঁচানোর চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে বড়ো ছেলের জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বধূ আনিবার কথাটা স্বামীর সঙ্গে দিবারাত্র আলোচনা করিল। আর সকলের সেবা করিতে করিতে মনস্থির করিয়া নগেনকে চিঠি লেখার সময় প্রমীলা করিয়া উঠিতে পারিল না।

তারপর বিমলের ঘুম স্বাভাবিক হইয়া আসিল বটে, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মেজাজ এমন রুক্ষ হইয়া রহিল যে, বাড়িসুদ্ধ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিমলের মেজাজ শোধরাইল অকস্মাৎ। বিনা নোটিশে সে ঠান্ডা হইয়া গেল। কিছুতেই বিরক্ত হয় না, রাগের কারণ থাকিলেও রাগ করে না, ঘাড় গুঁজিয়া খায়, আপিস যায়, বই পড়ে আর ভাবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শান্তার মৃত্যুর জন্য প্রমীলা মনে মনে বিমলকে অনেকখানি দায়ি করিয়াছিল। শান্তা যে খেলা করিতেছিল এটা সে পছন্দ করে নাই, শান্তাকে সে একেবারে নির্দোষ মনে করে না, কিন্তু খেলা করার অপরাধে ওকে অত বড়ো শাস্তি বিমল কী করিয়া দিল ! বিমল দৈত্য, না দানব ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদার অবস্থা দেখিয়া প্রমীলা অল্পবিস্তর মত পরিবর্তন করিল। সে ভিতরের খবর কতটুকু জানে যে বিচার করিতে বসিয়াছে ? শান্তা যা করিয়াছে হয়তো নিজের দায়িত্বেই করিয়াছে, কারও কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করে নাই।

এমনকী বিমলকে সে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া দেখিল।

বলিল, লোকের বউ মরে জান তো দাদা ? অনেকদিনের চেনা সন্তানের মা ভালোবাসার বউ ? মরে তো ?

মরে।

তার শোকও মানুষ ভুলে যায়। তোমার বউ মরেনি। তোমার এ রকম শোকের মানে কী ?

মানে নেই।

তবে ?

তবে আবার কী ? মানে নাই বা রইল, শোক থাকলেই হল।

তা কেন থাকবে ? দুঃখ থাকে থাক, শোক থাকবে কেন ?

সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না মিলি।

প্রমীলা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমার কথাগুলো তুমি বড়ো হালকাভাবে নিলে দাদা।

বিমল শুধু বলিল, না। হালকাভাবে নিইনি।

প্রমীলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তুমি জান শান্তার না মরলে চলত না ?

কার চলত না ? বিমল সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল।

শান্তার চলত না। মরে ও মুক্তি পেয়েছে। মরণ ওর সমাপ্তি নয়, সমাধান। ও ছিল খোঁটায় বাঁধা জীব, কিন্তু এমন অবস্থাই সৃষ্টি হল, সামনে হোক, পিছনে হোক না চলে ওর উপায় রইল না। সেটা কী রকম ভয়ানক অবস্থা ভেবে দ্যাখো তো ? মরে ওর সে সমস্যার মীমাংসা হয়েছে।

খোঁটা উপড়ে গেলে আরও ভালো মীমাংসা হত।

অবুঝের মতো কথা বোলো না দাদা। ওর জীবনে সে কি সম্ভব ছিল? না দাদা, শান্তার মৃত্যুকে তুমি মেনে নাও।

না মেনে পথ কোথায় রে ?

এ ভাবে মানা নয়। মেনে নাও যে ও সহজভাবে মরেছে—আর দশটি বউয়ের মতো ওরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

এটা মেনে নিলে কী হবে ?

ওর জন্য তোমার শোক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। জান দাদা, শান্তা তোমাকে ক্ষমা করে গেছে।

বিমলের স্তিমিত চোখ দুটি অনেকখানি খুলিয়া গেল। ক্ষুব্ধ কঠোর স্বরে সে বলিল, বড়ো হয়ে তুই বড়ো অসুবিধায় ফেলেছিস মিলি—তোকে ধমক দিতে বাধোবাধো ঠেকে। যা বুঝিস না, তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না, যা তুই।

প্রমীলা উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

অথচ এ সব আলোচনা অনাবশ্যক নয়। শান্তা যেভাবে মরিয়াছে, শান্তার কথা বলিতে তার ভালোলাগা উচিত। খোঁটা উপড়ানোর কথা হইতে তাহারা অনায়াসে সমাজসমস্যায় আসিয়া পড়িতে পারিত। বিমল উত্তেজিত হইয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যের সাহায্যে তার মনোবেদনা, তার নালিশ ব্যক্ত করিতে পারিত। মানুষ তো সকল অবস্থাতেই শিশু। যে চৌকাঠে হোঁচট লাগিয়াছে সেটিকে আঘাত করিতে পারিলে মানুষ অনেকখানি তৃপ্তি পায়।

শান্তার সম্বন্ধে বিমলের এমন কঠোর বাক্‌সংযম কেন ?

কিন্তু প্রমীলা ছাড়িল না। বিকালে বিমল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে বলিল, শান্তা ক্ষমা করে গেছে বলাতে তখন চটলে যে ? ক্ষমা বললে অপরাধের কথা এসে পড়ে এই জন্য ? তুমি বলতে চাও তোমার কোনো অপরাধ ছিল না ? নিজেকে ভুলিয়ো না দাদা। খাঁচা ভাঙবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ঘেরাটোপ তুলে তুমি খাঁচার পাখিকে আকাশ দেখিয়েছিলে।

সেটা পাখির সৌভাগ্য।

কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না দাদা—কেঁদে ফেলব। মরুর পাখিকে তোমার সবুজ সম্পদটুকু দেখিয়ে ভোলাবার অধিকার কেউ তোমাকে দেয়নি। তুমি অন্যায় করেছিলে।

বিমল বলিল, অধিকারের কথাটা না বললে তোর উপমা জোরালো হত।

এবার প্রমীলা রাগ করিল।

তা হলে স্পষ্ট কথা বলি, তুমি ভেবো না তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পারছি না। যে কীর্তি তুমি করেছ, সে বিষয়ে তোমার থিয়োরি আর প্রিনসিপল তোমারই থাক,—ও রকম করার অধিকার তোমার ছিল না। যে শিশু তাপ চায়, পুড়তে চায় না, অভিজ্ঞতার অভাবে তাপের খোঁজে সে যদি আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়তে চায়, তুমি তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে ? শান্তা কী চেয়েছিল সে তো তুমিও জান—আমিও জানি !

বিমল ধীরে ধীরে বলিল, দূর থেকে তাপ চেয়ে কাছে এসে শান্তা যে আগুনে পুড়তে চায়নি, এটা তুই কী করে জানলি ?

বলিয়াই বোনের উপর অভিমান করিয়াই সে যেন তার কথাটাকে আদালতের যুক্তিতর্কে টানিয়া নিয়া গেল।

ও যে আমাকে পোড়াতে বাধ্য করেনি, তাই বা তুই অনুমান করলি কীসে ?

প্রমীলা থতোমতো খাইয়া গেল। বদমেজাজি বিমল যে তাহাকে এতক্ষণ বরদাস্ত করিয়াছে, এটাও এতক্ষণে তার খেয়াল হইয়াছে।

বিমলের যুক্তিটা প্রমীলা খানিকক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিল। তারপর একটু ভয়ে ভয়েই, তবু, একজনের মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে—

মুহূর্তের দুর্বলতা ! বিমল সিধা হইয়া গেল, বোকার মতো কথা বলিস কেন ? মুহূর্তের দুর্বলতায় বড়ো জোর একটা কবিতা লেখা যায়, তার বেশি কিছু হয় না।

প্রমীলা আর কথা বলিবার সাহস পাইল না। দাদার কাছে এখনও তার অনেক শিখিবার আছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় যা তার অনেকদিন আগে শেখা উচিত ছিল। বাস্তবিক দুর্বল মানুষের আবার মুহূর্তের দুর্বলতা কী ?

বিমল বলিল, আজ সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একটা মজার খবর শুনলাম।

কী খবর ?

তোর বিয়ে—সামনের শুক্রবার।

মানে ?

মানে, নগেন কাকিমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। চিঠির আসল খবরটা এই যে, শুক্রবার অর্থাৎ কাল তোর বিয়ে হবে।

প্রমীলার মুখ সাদা হইয়া গেল।

এ কথা লেখার মানে কী দাদা ?

আমিও কিন্তু তাই ভাবছি। বোধ হয় কিছু শুনে থাকবে।

প্রমীলা অল্প একটু মাথা নাড়িল।

কলকাতা থেকে তুচ্ছ প্রমীলার সম্বন্ধে উড়ো খবর লখনৌ পর্যন্ত যায় না।

এটা ওর বানানো কথা।

লাবণ্যের চালও হতে পারে।

না। নিজে না জানলে কারও মুখ থেকে এ কথা শুনলে বিশ্বাস করবে না।

আমাদের বাড়ির কেউ না বললে---

বিমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, একটা সামান্য কথা নিয়ে তুই যে খেপে গেলি মিলি !

প্রমীলা ম্লান মুখে বলিল, না, খেপিনি।

পরদিন মোটা টাকার ইনশিয়োর করা এক পার্সেল আর দুখানা চিঠি আসিল। একখানা চিঠি আর পার্সেলটি বিমলের নামে, অন্য চিঠিটা প্রমীলার। পার্সেল খুলিতে সোনা আর হিরার ঝলকে ভাইবোনের চোখ ঝলসিয়া গেল।

প্রমীলার বিবাহে নগেন উপহার পাঠাইয়াছে।

বিমলের পত্রখানা সংক্ষিপ্ত, সুরটা অপমানিত বন্ধুর। নগেন লিখিয়াছে, গোপনতার কী প্রয়োজন ছিল ? যে প্রয়োজনই থাক, প্রমীলাকে সে স্নেহ করে। তার স্নেহের নিদর্শনটি ফেরত দিয়া তাকে যেন অবহেলার উপর অপমান করা না হয়।

প্রমীলার পত্রখানা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সুরটা আহত অভিমানী প্রেমিকের।

শেষটুকু এই : আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী করলে তোমার পাথরের মতো শক্ত বুকে একটু আঁচড় কাটা যাবে বসে বসে তাই ভাবছি। তুমি সুখী হও, এ কামনা আমি করি, কিন্তু তোমার জন্য আমি অসহ্য মনোবেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি ভেবে সারাজীবন তুমি যে অতিরিক্ত সুখ পাবে আশা করছ, সেটুকু তোমাকে দেবার মতো উদারতা আমার নেই। আমার এ হীনতাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

বিমলের আজ ভয় হইয়াছিল।

কী লিখেছে রে ?

প্রমীলা চিঠিখানা তার হাতে দিল। পড়িয়া শেষ করিয়া সে চাপা গলায় বলিল, রাসকেল।

প্রমীলা কান্না চাপিয়া বলিল, শেষটা পড়লে দাদা ? আমি ও রকম হীন ?

বিমল নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিল, শোন, নগেন একটা রাসকেল।

প্রমীলা এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

এটা হল লাবণ্যকে বিয়ে করার ভূমিকা।

প্রমীলার ভাব দেখিয়া মনে হইল ইহা সে জানিত।

বিমল চকচকে গয়নাটা হাতে তুলিয়া নিল।

আর এটা হল আমার বোনের সঙ্গে খেলা করার দাম। আমার বোনকে পাঠাবার সাহস পায়নি, আমাকে পাঠিয়েছে। ওকে যে আমি রাস্তায় ধরে জুতোব না, শুধু এই অনুগ্রহের জন্য মিলি দামটা তোকে পাঠায়নি, আমায় পাঠিয়েছে।

প্রমীলার মাথা ঘুরিতেছিল। কিন্তু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নগেন কেন রাসকেল জানিস ? লাবণ্যকে বিয়ে করার জন্য নয়। দুর্বল মানুষ ও রকম করে। এই রকম চিঠি আর গয়না পাঠিয়েছে বলেও ওকে আমি রাসকেল বলিনি মিলি। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য এ রকম কাজ দুর্বল মানুষ করে। ও রাসকেল অন্য কারণে। আমরা ভূমিকাটা ধরতে পারব এ কথা জেনে এই চিঠি লিখেছে। গয়নাটা কীসের দাম বুঝতে পারব জেনে গয়না পাঠিয়েছে। ওর প্রকৃতি হল এই। আর সেই জন্যই ও রাসকেল। চোখে ধুলো দিতে পারবে না জেনেও আমাদের চোখে ধুলো না ছুঁড়েও থাকতে পারেনি—ও এতবড়ো রাসকেল।

প্রমীলাকে বিমল নিজের ঘরে টানিয়া নিযা গেল। দুই কাঁধ ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বিছানায় বসাইয়া দিল।

আজ তোর কোনো কাজ নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। কেউ তোকে ডাকবে না। এখানে বসে রাসকেলটার কথা ভাব আর ঘেন্না করতে শেখ। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোর গরিব আর সাদাসিধে বর এনে দেব—তাকে তোর ভালোবাসতে হবে।

প্রমীলা বলিল, না।

না ! না কেন ?

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

না কেন শুনি ? তুই কী নাটক করতে চাস নাকি ? নগেনের জন্য তোর মাথাব্যথা থাকতে পারে না। রাসকেল মানুষের সঙ্গে লোকে ভুল করে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে না।

প্রমীলা শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

মন শক্ত কর। আমি তোকে কথা দিচ্ছি বিয়ের সাতদিনের মধ্যে রাসকেলটাকে ভুলে যাবি।

প্রমীলা বলিল, না না।

না কী রকম ? আমি তোকে ঠকাব না মিলি।

সে হয় না।

বিমল নিঃশব্দে তার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একদিন আর একজনের মুখে সে এই কথা শুনিয়াছিল। শান্তা যে দিন তার সঙ্গে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে রাজি হয় নাই সেদিন।

নীচে রান্নাঘরে ভাত পোড়া-লাগা পর্যন্ত দুইজনেই চুপচাপ বসিয়া রহিল। পোড়া গন্ধ নাকে লাগিতে প্রমীলা উঠিল।

বিমল বলিল, বোস।.... হয় না, না ? বেশ ! না হয় না হবে ! একজন মরে বেঁচেছে, তুই বেঁচে মরে থাক। কিন্তু নগেনকে আমি শাস্তি দেব মিলি।

কী লাভ হবে ?

লাভ না হয়, লোকসান হবে। কী এল গেল ? কী করব জানিস ? নগেনের ওপর লাবণ্যকে জয় করব। নগেনের মাথা হেঁট করে দেব। শোন, লাবণ্যকে তুই চিনিস না, ডাকলে বাসরঘর থেকেও বেরিয়ে আসবে।

ছিঃ দাদা ও সব বুদ্ধি কোরো না।

বিমল ছিটকাইয়া আসিয়া বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া বলিল, বুদ্ধি করা পর্যন্তই মিলি, পারব না। মেয়েদের আর বিশ্বাস করি না। লাবণ্যও হয়তো ছাত থেকে ঝাঁপ দিতে জানে।

বাজার করিয়া আসিয়া প্রমথ নীচে হাঁকাহাঁকি করিতেছিল। প্রমীলা বলিল, আমরা কিছুই করব না দাদা। চুপ করে থাকব।

বিমল বলিল, সেই ভালো। আমরা খেয়ালি, আমরা বোকা, আমরা ভীষণ ভুল করেছি—অন্যায়ও করেছি, কিন্তু আমরা রাসকেল নই। মরলে আমাদের স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ব্যস আমরা আর কিছু চাই না।

কিছুই তাহারা করিল না। বিমল গয়নাটা নগেনকে ফেরত পাঠাইতে যাইতেছিল প্রমীলা বারণ করিল।

কাজ কী দাদা ? কোনো মিশনে কি হাসপাতালে দিয়ে দাও।

তা হলে নগেন ভাববে আমরা নিয়েছি।

ভাবুক না ?

ঠিক ! বিমল প্যাকেটের উপর ঠিকানা লেখা কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। একটা কাজ কিন্তু করতে পারব না মিলি। ওর দয়ার চাকরিটা করা পোষাবে না।

নাই বা করলে ? জগতে আরও ঢের চাকরি আছে।

একটা মোটর দুর্ঘটনার কথা বিমল প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সেই ছেলেটিকে বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সেও নগেনের কীর্তি। একটা ছোটো ছেলে মাসিক একশো পঁচিশটা টাকার বিনিময়ে এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গরচনার স্বপ্ন দেখিতেছিল, হাতের মোয়াটি কাড়িয়া নিয়া নগেনই ছেলেটাকে বাসের সামনে ঠেলিয়া দিয়াছে।

পরদিন বিমল বলিল, লাবণ্যের কপাল মন্দ মিলি।

আবার বলিল, নগেন সব নেবে—দাম দেবে টাকায় তাও বেশি নয়। বাজারের একটা মেয়েমানুষের জন্য যা লাগে, তার চেয়েও কম।

কথাটা বলিয়া তাহার অনুতপ্ত হইতে দেরি লাগিল না। কারণ, একেবারে নাটকীয় প্রথায় প্রমীলা মূর্ছা গেল। তার মূর্ছা নাটকীয় নয়। সে সুস্থ হইলে বিমল বলিল, আড়ালেও কাঁদিস না বুঝি ? বোকা।

দশম পরিচ্ছেদ

তারপর কিছুদিন কাটিয়া গেল। অনুরূপা পায়ে ভর দিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইতে পারার শক্তি অর্জন করিল, ছেলের চাকরি যাওয়ার সংবাদে প্রমথ মুষড়াইয়া পড়িল, এবং বিমল ও প্রমীলার মানসিক বিপর্যয়গুলি সুনিশ্চিতভাবে ও দ্রুতবেগে ঘটিয়া চলিল। নতুন কিছু ঘটে না, তবু প্রত্যেকদিন জীবনটা যেন নবভাবে বোধগম্য হয়। দুঃখ বদলায় না, ভোগ করিবার প্রক্রিয়াটা বদলায়। বিমল শান্তার মৃত্যুর এক-একটা নতুন দিক আবিষ্কার করে, প্রমীলার পোড়া কপালের একটা-একটা নতুন ফোসকা ফাটিয়া যায়।

দাদার জন্য প্রমীলার কখনও কান্না পায়, বোনের জন্য বিমলের বুকের ভিতরটা কখনও পুড়িয়া যায়।

দুপুর রাত্রে বিমল ডাকে, মিলি শোন—আয় আমার ঘরে।

প্রমীলা উঠিয়া যায়।

আয় দাবা খেলি।

দুজনেই চাল ভুল করে, কেন খেলিতেছে, কী খেলিতেছে দুজনেই ভুলিয়া যায়, বিমলের শ্রান্ত চোখ জ্বালা করে, প্রমীলার নিদ্রাতুর দেহে সজাগ মস্তিষ্ক দপদপ করিতে থাকে।

বিমল বলে, খেলা থাক মিলি।

প্রমীলা বলে, থাক।

তোর ঘুম পাচ্ছে ?

না। তোমার ?

আমারও না।

তবেই মুশকিল দাদা।

কী করা যায় বল তো ?

প্রমীলা বলিতে পাবে না। দুইজনে খানিকক্ষণ বোবাব মতো বসিয়া থাকে।

বিমল অপরাধীব মতো বলে, ছটফট করছিস দেখে ডেকে আনলাম, কিন্তু এ যে আরও বিশ্রী হচ্ছে রে ! একঘণ্টা তোকে ভুলিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা আমাব নেই।

তারপর বলে, মরবি ?

না।

বল, দু মিনিটে মেরে ফেলছি। টেরও পাবি না।

না, মরবার কিছু হয়নি। প্রমীলা একটু হাসে।

তবে কী করা যায় বল তো ?

আবার তাহারা অনেকক্ষণ বোবাব মতো বসিয়া থাকে।

শেষে প্রমীলা বলে, যাই, শুইগে।

যা। তোকে আব ডাকব না মিলি। আজ যেন ঠাট্টা করলাম তোর সঙ্গে।

প্রমীলা ফিরিয়া যায়।

দুজনের কেহই টের পায় না ও বাড়িতে এক বোতল মদ গিলিয়া শান্তাব একটা শাড়ি দিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিযা অধর কত আবামে ঘরের মেঝেতে ঘুমাইয়া আছে।

একদিন কেদার আসিল। সম্পর্কে তিনি মামা হন, কিন্তু কত দূব সম্পর্কে বলা কঠিন।

কেদার সম্পাদক।

বস্তা বার কর, বাছি।

ভাঙা সুটকেশ খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

খালি যে রে !

যা ছিল পুড়িয়েছি।

সব ? কেদার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ছেলেমানুষি লেখা সব, কী হবে রেখে ?

যা হবাব হত, পোড়াতে গেলি কেন ? আমাকে দিলি না কেন ? না হয় আমি নিজের নামে ছাপতাম !

কী চাও বল না, কেদারমামা।

গল্প দে—ভালো আব ভদ্র অশ্লীল গল্প।

নেই।

টাকা দেব—দশ টাকা।

নেই মামা।

আচ্ছা, ভালো হলে পনেরোই দেবখন, ডাকাত কোথাকাব !

বিমল মাথা নাড়িল।

তবে সত্যি নেই। গাধা ?

নেই।

কবিতা ? বল তাও নেই !

কবিতা দিতে পারি একটা।

কবিতার নূতন খাতাটা সে কেদারের সামনে ফেলিয়া দিল। পাতা উলটাইয়া কেদার বলিলেন, মোটে একটা ?

ওই ছাপ না, আরও দেব।

কেদার নীরবে কবিতাটি পাঠ করিলেন। বিমলের গায়ে খাতাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, তুই গোল্লায় যা।

রাগে গরগর করিতে করিতে কেদার বাহির হইয়া গেলেন।

প্রমীলা বলিল, একটা গল্প লেখ না ? এ মাসে খরচের টানাটানি পড়বে।

আমি ফরমাশি ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক নই মিলি। তিনদিন সিগারেট না খেয়ে থেকেছি, নির্লজ্জের মতো টাকা ধরে করেছি, কিন্তু বাজে লেখা একটাও লিখিনি।

তবু—

বিমল একটু ভাবিল।

আচ্ছা লিখব।

রাত্রি তিনটা পর্যন্ত বিমল লিখিল। সমস্ত সকালটা লেখা সংশোধন করিল এবং দুপুরবেলা টাকা আনিতে গেল।

কেদার বলিলেন, সাংঘাতিক গল্প। দিস তো রে এ রকম আর একটা দুটো। মাঝে মাঝে বড়ো বিপদে পড়ি।

প্রমীলা খুশি হইয়া বলিল, লক্ষ্মী ছেলে।

খরচের টানাটানিতে তার দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। অনুরূপা আঁতুড়ে ঢোকার পর প্রমথ সহসা প্রমীলার হাতে সংসার খরচের ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।

একদিন অধর আসিল। বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাওয়ার মাদুরে বসিয়া প্রমথের সঙ্গে কথা বলিতে তার কোনো দ্বিধা দেখা গেল না।

কাল আমার বোন আর দূরসম্পর্কের পিসিমা আসবে—কিন্তু কাজটা ওদের দ্বারা নির্বাহ হবে কিনা সন্দেহ। অপঘাত মৃত্যু হল, শ্রাদ্ধটা ভালোভাবেই করব ভাবছি। প্রমীলাকে দুদিন ধার দিতে হবে, সরকার মশায়। দেখবে শুনবে, গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে।

প্রমথ বলিল, বেশ।

প্রমীলাকে ডাকিয়া অধর আবেদন জানাইল। প্রমীলা তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। যাওয়ার আগে অধর বলিল, বিমলবাবু বাড়ি নেই ?

দাদা ওপরে আছে। ডাকব ?

থাক। অধর বিদায় নিল।

খবর শুনিয়া বিমল বলিল, তুই যাবি কী রকম ?

শান্তার কাজটা ভালোভাবে না হলে মন খুঁতখুঁত করবে দাদা।

ওর বাড়ি তোকে যেতে দিতে সাহস হয় না।

ভয়ের কী আছে ? অধরবাবু গুন্ডা নয়—ভদ্রলোক।

ওকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে। ভেতরে . ‍তরে লোকটা মরে গেছে।

বিমল চিন্তিতভাবে বলিল, সেটা ভালো লক্ষণ নয়। ভেতরে মরে যারা বাইরে বেঁচে থাকে, তারা জীবন্ত ভূত। অনেক ভৌতিক কাণ্ড করতে ওরা ভালোবাসে। কিন্তু আমাকে খুঁজছিল কেন ?

কী করে বলব? কাজটার জন্য সাহায্য করতে বলত হয়তো। কিন্তু তোমার গিয়ে কাজ নেই দাদা।

পরদিন বিমল একটা খবরের কাগজের আপিসে চাকরির খোঁজে যাইতেছিল, বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া অধর তাহাকে ডাকিল।

বিমলবাবু, শুনুন।

দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিমল বলিল, বলুন।

রাগ রাখবেন না। মনের অবস্থা কীবকম ছিল বুঝতেই পারছেন, তখন যাই বলে থাকি তার কোনো দাম নেই। বসুন না এসে ?

বিমল শান্তভাবে বলিল, না, কাজে যাচ্ছি। আপনাকে স্পষ্ট করেই বলি অধরবাবু, রাগটা দমন করতে পারি, কিন্তু ঘৃণা তো কথা শুনবে না !

অধর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনি শান্তার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আপনাদের বন্ধুত্ব আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ভুল করেছিলাম। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ছাড়া শান্তার স্মৃতিকে সম্মান দেখানোর আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু ঘৃণা যে কথা শোনে না এ কথা সত্যি।

শান্তাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন—আমাকে বাঁচাতে দিতে পারতেন।

শান্তা বাঁচতে চায়নি। ও আপনাকে ভালোবাসত। ওকে বাঁচালে কী হত জানেন ? আবার ছাত থেকে ঝাঁপ দিত। মিছামিছি ওর যন্ত্রণা বাড়াতে চাইনি।

এমনিভাবে বিনা ভূমিকায় এবং সংক্ষেপে একজন কৈফিয়ত দিল এবং শান্ত অবিচলিতভাবে আর একজন শুনিয়া গেল। শত্রুতা মানুষকে এমনই অন্তরঙ্গ করিয়া দেয়। এমন কী আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও তারা বোধ কবিল না। বিমল নীরবে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অধর আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

চাকরিটা সে পাইল না, কারণ চাকরি খালি ছিল না। কিন্তু রাস্তায় সজনীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

তোমাকে খুঁজেছিলাম বিমল।

আমাকে ? কেন ?

তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করার হুকুম আছে। খাবে আর কবিতা শুনবে।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল, বেশ তো।

কবে তোমার সুবিধা হবে ?

বিমল সবিনয়ে বলিল, সজনীকাকা, আমার সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মঙ্গলবার হলে একটু উপকার হয়। বাড়ির পাশে সেদিন একটা বিশ্রী শ্রাদ্ধ হবে, পাড়ায় থাকতে চাই না। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায় ?

বেড়াতে—গঙ্গার ধারে। যাবে ?

বিমল মাথা নাড়িল—না।

মোটরে চাপিয়া গঙ্গার ধাবে বেড়াইবার শখ বিমলের ছিল না।

মঙ্গলবার সে সকাল সকাল নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল, পেট ভরিয়া খাইল এবং কান ভরিয়া কাকিমার কবিতা শুনিল। কাকিমার প্রতিবেশিনী বি এ ফেল একটি লাজুক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিল এবং আধঘণ্টার মধ্যে তাকে জানাইয়া দিল যে, 'তুমি আমার বোন'। কেন জানাইল কে জানে ! মেয়েটি অবাক হইয়া ভাবিল, কবিরা সত্যি অসাধারণ !

শেষে কাকিমার গোটাকুড়ি কবিতা সঙ্গে নিয়া এবং সেগুলি মাসিকে ছাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে কথা দিয়া বিকালে বাড়ি ফিরিল। এবং বিছানায় শুইয়া সেই অবেলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্নে আসিল লাবণ্য। লাবণ্য দেখিতে অনেকটা শান্তার মতো হইয়া গিয়াছে, তার কানের দুল দুটি অনেকটা কাকিমার প্রতিবেশিনী সেই লাজুক মেয়েটির দুলের মতো। চারিদিকে কীসের একটা গোলমাল চলিতেছিল এবং কী কারণে যেন একেবারেই সময় ছিল না।

ও সব বাজে কথা। আমি তোমায় ভালোবাসি।

লাবণ্যও সঙ্গে সঙ্গে বলিল, আমি বাসি না ?

তারপর স্বপ্নটা ঝাপসা দুর্বোধ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রমীলা তার ঘুম ভাঙাইল। এ কী ? মরবে নাকি ?

বিমল বলিল, সারাদিনে আজ সাঁইত্রিশটা কবিতা শুনেছি—সাধারণ লোকের সাঁইত্রিশ বছরের পরিশ্রম। ঘুমের দোষ কী ?

মুখ ধোও, চা আনছি।

কড়া চা পান করিয়া বিমলের ঘুমের জড়তা কাটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, কী রকম শ্রাদ্ধ হল ? এখনও গোলমাল চলছে যে রে !

শ্রাদ্ধের বর্ণনা শুনে কাজ নেই দাদা।

শুনিই না। শান্তাকে স্বর্গে ঠেলে দেওয়ার মতো হয়েছে তো ?

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

বিমল সহসা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

মরা মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি ! শ্রাদ্ধ হচ্ছে ! কেন, মরলে কি মানুষ অপরাধ করে নাকি ? শরীরটা পচে যাবে পুড়িয়ে ফ্যালো—শ্রাদ্ধ আবার কী ? যত সব অমানুষিক কাণ্ড—বর্বরতা।

গলা নামাইয়া বলিল, হইচই ভালো লাগে, কিন্তু ছুতোর কি অভাব আছে ? একটা বানিয়ে নিলেই হয়। জন্মালে উৎসব নেই, শাঁখটা শুধু একটু বাজে, মরলে সমারোহের সীমা থাকে না।

অভিযোগটা সুস্পষ্ট, কিন্তু মানে বোঝা দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধটা সমারোহ বটে, কিন্তু উৎসব নয়। উৎসব হইলেই বা ক্ষতি কী ? বুকে শোক থাকিলে মানুষ কি উৎসব করিতে পারে না ? বিমলের নালিশ কীসের ? কিন্তু কথাটা নিয়া সে ঘাঁটাঘাঁটি করিল না।

বলিল, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি দাদা।

আমার জন্য ? কী জিনিস ?

শান্তার একটা স্মৃতিচিহ্ন।

চাইনে।

চাইনে কেন ? কী চিহ্ন আর তোমায় আমি দিতে পারব—একটু চুলের জটা। চুলে তো হাত দিত না, সব জট বেঁধেছিল। একটা জট বোধ হয় খোলেনি, কাঁচি দিয়ে কেটে ।। সকালে গিয়েই দেখি ওর ড্রেসিং টেবিলে আয়নায় টিপায় গোঁজা আছে। খুলে নিয়ে এলাম।

বিমল বলিল, তোর কাছেই থাক।

প্রমীলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে আশা করিতেছিল শান্তার স্মৃতিচিহ্নের জন্য বিমল লুব্ধ হইয়া উঠিবে। চুলের জটা দেহের অংশ, অস্পষ্ট সুবাসের স্মৃতি নিয়া বহুকাল অবিকৃত থাকিবে। এর চেয়ে দামি স্মৃতিচিহ্ন আর কী হইতে পারে ? বিমলের নিস্পৃহ প্রত্যাখ্যান প্রমীলা বুঝিতে পারিল না। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, বাইরের স্মৃতিচিহ্নের মান নেই বুঝি তোমার কাছে ?

বিমল রাগ করিয়া বলিল, কী যে বলিস তুই। কবি হলেও আমার কবিত্বের সীমা আছে।

তবে নেবে না কেন ? দয়া করে নাও দাদা। জটাটা আমার অসহ্য হয়েছে। সকাল থেকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছি, কেবলই মনে হয়েছে কে যেন আমার আঁচল ধরে টানছে। এটা নিয়ে আমায় রেহাই দাও।

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কাছে উপযুক্ত মর্যাদা পাবে না।

প্রমীলা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, সে ভয় কোরো না দাদা। শান্তা এখন বেঁচে নেই, ওর স্মৃতিচিহ্নের যোগ্য মর্যাদা তুমি দেবে। কথাটায় আঘাত ছিল। নীরবে তাহা সহ্য করিয়া বোনকে বিমল ক্ষমা করিল।

সে হয় না মিলি। আমার কাছে শান্তার যে স্মৃতিচিহ্ন আছে, তার কাছে আর সব স্মৃতিচিহ্ন তুচ্ছ হয়ে যাবে। আমি হয়তো ওটা হারিয়েই ফেলব।

প্রমীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, তোমার কাছে কী আছে দাদা ? দেখাও।

থাক। দেখে কাজ নেই। ভয় পাবি।

ভয় পাব ? স্মৃতিচিহ্ন দেখে ভয় পাব ? তুমি পাগল নাকি ?

বিমল একটু ভাবিল। তারপর বলিল, আচ্ছা, দ্যাখ তবে ?

বলিয়া বিছানার বালিশটা সে তুলিয়া নিল। তলে শান্তার রক্তমাখা ব্যান্ডেজ। চাপচাপ রক্ত কালো হইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। উঁচু করিয়া ধরিয়া বিমল বলিল, এর কাছে তোর চুলের জটা ?

প্রমীলা দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বলিল, ঢেকে দাও—ঢেকে দাও। আমি চাই না দেখতে ! ব্যান্ডেজটা বিমল বালিশের তলে চাপা দিল। বলিল, চোখ খোল।

চোখ খুলিয়া প্রমীলা পলকহীন দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দাদার কপালটা যেন বেশি চওড়া হইয়া গিয়াছে। মুখে কতগুলি রেখা দেখা দিয়াছে, আগে যার অস্তিত্ব ছিল না।

রুদ্ধশ্বাসে সে বলিল, কোথায় পেলে ?

চুরি করেছি—ডাকাতিও বলতে পারিস। শান্তাকে তখন বাইরে এনেছে। কারা যেন কপালে সিঁদুর লেপছিল। সোজা গিয়ে ব্যান্ডেজটা খুলে আনলাম সকলে হাঁ করে আমার কীর্তি দেখল।

প্রমীলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে কাঁদিয়া বলিল, তোমার জন্য আমার ভয় করছে দাদা !

বিমল বলিল, ভয় কী ?

অধর আসে যায়, প্রমথের সঙ্গে দাবা খেলে, সাধারণ লোকের মতো কথা সাধারণভাবে বলে, শ্রান্ত অপরাধী মানুষের মতো মাথা নিচু করিয়া থাকে। গম্ভীর লোকটার ভিতরটা যেন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তার সহজ কথাবার্তা ওই স্তব্ধতার কল্যাণে যেন অসাধারণ হইয়া ওঠে। মনে হয় একটা অজানা সুর বাক্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, একটা অতিরিক্ত গভীর অর্থ অন্তরালে গোপন থাকিতে শুরু করিয়াছে।

তার যেন গোপন বৈরাগ্য। রাগ নাই, হিংসা নাই, শত্রু নাই, সকল মানুষ তাহার আত্মীয়, নিজের জীবনকে সে সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে। যার এক হাত আজ তার বুকে ছুরি মারিবে, তার অন্য হাতে নিজের প্রাণকে সে সঁপিয়া দিবে। সে কারও ভালোবাসা চাহিবে না, কিন্তু সকলকে ভালোবাসিবে।

প্রমীলা মুগ্ধ হইয়া গেল। তার নিজের অবস্থা শোচনীয়, এক অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত খেয়াল তাকে শেষ করিয়া দিয়াছে, স্বামী থাকিতে সে কুমারী। দিন কাটিলে তার রাত কাটিতে চায় না, একটা নিষ্ঠুর ভোঁতা অশান্তি জীবনের স্বাদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তিক্ত ও বিস্বাদ করিয়া দিতে পারে নাই। কঠিন অসুখে যেমন জীবনও থাকে না, মরণও থাকে না, একটা অকথ্য অবস্থায় দিন কাটিতে থাকে, প্রমীলার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তবু শান্তা যে দুটি মানুষকে ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে, তাদের একটু সুস্থ করিয়া তোলার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। পরের জীবনে মাধুর্য সঞ্চারিত করার শিক্ষা তাহার আদিম দিনের, মানুষের উপর শ্রদ্ধা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে নিজেকে সে এ শিক্ষা ভুলিতে দিল না !

বিমল ও অধরের কাছে নিজেকে সে দুঃখের দিনের বান্ধবী করিয়া রাখিল।

বিমল মাঝে মাঝে আপত্তি করে। বলে, ও লোকটার সঙ্গে তোর অত মেশার দরকার কী ?

ও আমার কী করবে ? যে রকম মনে করতাম, সে রকম নয় দাদা—লোকটা ভালো।

তুই তো খুব মানুষ চিনিস।

যাই হোক, বিমল আপত্তি করে, কিন্তু বাধা দেয় না। নিজে সে অধরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

এমনিভাবে শরৎকালটা কাটিয়া গেল। শীতের প্রথমে নগেন ফিরিয়া আসিল। বিমল খবর পাইল লাবণ্যের কাছে।

সে নিজেই লাবণ্যের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল।

লাবণ্য টেনিস খেলিতেছিল, খেলা ফেলিয়া আসিয়া বিমলকে ড্রয়িং রুমে বসাইল। বলিল, কবিরা যেমন না বলে যায়, তেমনি না বলে আসে। ব্যাপার কী ?

নগেনটা রাসকেল।

জানি।

ছ মাস খেলা করে মেয়েদের ভুলে যাওয়া ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তাও জানি। তুমি আমাকে সাবধান করে দিতে এসেছ ?

হ্যাঁ।

আমার জন্য তোমার ভাবনা হয় ?

হয়।

ভাবনা হয়, কিন্তু ভালোবাসা হয় না। লাবণ্যর মতো মেয়ের কাছেও তুমি একটি রহস্য হয়ে রইলে বাবু।

লাবণ্য একটু হাসিল, কিন্তু আমার জন্য ভাবনা নেই। তোমার নগেন আমার কিছু করতে পারবে না।

তুমি ওকে জান না লাবণ্য।

জানি। খুব ভালো করে জানি। ওর ঢের টাকা। লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

বিমল আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, সেদিক দিয়ে তোমায় ঠকাবে না। নিজেই হাজার দুই দেবে—আদায় করতে পারলে আর কিছু বেশি হতে পারে।

লাবণ্যর মুখ লাল হইয়া গেল।

আমার দাম দু হাজার টাকা।

নগেন ওই রকম দাম দেবে। ভালোবাসাটুকু ফাউ !

নগেন নিজেকে দেবে। ওর জীবনে আমি শেষ বৈচিত্র্য ?

বিমল সংক্ষেপে বলিল, ভালোই।

আমি খারাপ মেয়ে, না বিমল ?

বিমল বলিল, না। তুমি একটু দুষ্টু আর বুদ্ধিমতী।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বলিল, প্রমীলার কথা আমি জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে লখনৌ না গেলে নগেন বিভার সঙ্গে দার্জিলিং যেত। বিভাটা বোকা, ছ মাস পরে আর কার সঙ্গে নগেন কোথায় যেত কে জানে ! আমি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছি। অনেকগুলি মেয়েকে বাঁচাচ্ছি, নিজের জীবনযাত্রাকে সহজ করছি। বিমল চিন্তিত হইয়া বাড়ি ফিরিল।

অগ্রহায়ণের প্রথমে প্রমথ অসুখে পড়িল। পনেরো দিন পরে সে ভালো হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সংসারে সমস্ত কাজের উপর রোগীর সেবা করাটা প্রমীলার সহিল না। প্রমথ উঠিয়া দাঁড়াইতে সে বিছানা নিল।

কিছুদিন হইতে ছেলেমেয়েদের উপর প্রমথের আশ্চর্য টান দেখা যাইতেছিল, প্রমীলার অসুখের কদিন তার এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেবা সে করিতে জানে না, কিন্তু অপটু

হাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিল না। দুর্বল শরীর নিয়া দিবারাত্রি মেয়ের শিয়রে বসিয়া কাটাইতে আরম্ভ করিল। স্নেহপ্রবণ দুর্বল প্রকৃতির মানুষের মতো মেয়ের অসুখের সামান্য বাড়াবাড়িতেই নার্ভাস হইয়া পড়িতে লাগিল।

বাবার একটু অনুপস্থিতির সুযোগে বিমলকে ডাকিয়া প্রমীলা বলিল, বাবার হয়েছে কী ?

কিছুই হয়নি। কারও কারও হৃদয়টা চাপা থাকে, বাবারও তাই ছিল। চাপাটা আস্তে আস্তে সরে গেছে।

প্রমীলা বলিল, বাবার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, বাবা বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবে না দাদা। মরবার আগে এমনি বদলে যায়।

আবোল-তাবোল কথা না ভাবলে কি তোর দিন যায় না ?

প্রমীলার অসুখের সময় একটা ঠাকুর আসিয়াছিল, সে ভালো হইয়া উঠিবার পরেও ঠাকুর রহিয়া গেল।

অত তুই পারবি না মিলি। ঠাকুর থাক।

চলবে কী করে বাবা ?

যাবে যাবে—এক রকম করে চলে যাবে। বিয়ের পর তুই শ্বশুরবাড়ি গেলে চলবে কী করে ?

কিন্তু ঠাকুর রাখা চলিল না। ঠিকা ঝির পরিবর্তে দিনরাত্রির একটা চাকর আনিয়া প্রমথ ঠাকুরের অভাবটা পোষাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। রান্নাঘরে আগুনের কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, শীতকালটা—গরম পড়লে ঠাকুর রাখবই। ততদিনে বিমলেরও একটা চাকরি-বাকরি হবে।

খানিক তামাক টানিয়া—

ও কী বলে রে ?

কে ? দাদা ? কী বলবে ?

না, তাই বলছি। চিন্তিতভাবে আরও খানিক তামাক টানিয়া—আচ্ছা, তোর কী মনে হয়, বল তো। বিয়ে দিলে শুধরে যাবে ?

কে ? দাদা ? না, এখন দাদাকে বিয়ের কথা বোলো না। চাকরির চেষ্টা করছে। চাকরি হোক, কিছুদিন চাকরি-বাকরি করুক—তখন আপনা থেকেই সংসার করার ইচ্ছা হবে।

এখন ইচ্ছে নেই ?

না।

প্রমথ তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।

কোনোদিন মরে টরে যাব, তাই ভাবছিলাম—

প্রমীলা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল এবং তার মন কেমন করিতে লাগিল। প্রমথ কয়দিন দাড়িগোঁফ কামায় নাই, ডিবরির গাঢ় অনুজ্জ্বল আলোয় তার মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

রান্নাঘরে উনানের কাছে কাঠের পিঁড়িটা সন্ধ্যার পর প্রমথের আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। সকালে রোদে মাদুর পাতিয়া বসিয়া সে পাঁচুকে পড়ায়, ছোটোমেয়েটাকে পাশে বসাইয়া রাখে, সেদিনের নবাগত শিশুটি তার কোলে হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে। বিমলের সঙ্গে সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়া পরামর্শের তার অন্ত নাই।

বড়ো ব্যাপার নিয়াও পরামর্শ হয়।

প্রমীলার বিবাহ একটা বড়ো ব্যাপার।

অধর প্রস্তাব করিল বৈশাখে।

এবং দুদিনের মধ্যে দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া গেল। অনুরূপা এবং বিমল দুজনের সঙ্গেই প্রমথ অনেক পরামর্শ করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বজায় রাখিল নিজের।

অনুরূপা আপত্তির কিছু দেখিতে পাইল না, স্বামীর কথাতেই আগাগোড়া সায় দিয়া গেল। যুক্তির অভাবে বিমলের প্রবল প্রতিবাদ টিকিল না।

কী যুক্তি সে দিবে ? অবস্থা তাহাদের এমন নয় যে, রাজপুত্র কেনা চলিবে। মেয়ে তাহাদের এমন নয় যে, রাজপুত্র ছাড়া আর কারও সঙ্গে মানাইবে না। অধরের বয়স বেশি নয়, চরিত্র খারাপ নয়, চেহারা কদর্য নয়। সে ভালো চাকরি করে, তার বংশমর্যাদা আছে। তার সম্বন্ধে কোনো কথাই অজানা নাই, সুতরাং মেয়ের ভাগ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত আশা ও আশঙ্কার দোলায় দুলিতে হইবে না। শাশুড়ি-ননদের বালাই নাই, বিবাহের পরেই মেয়ে নিজের সংসারে স্বাধীন হইয়া থাকিবে। অধর যে প্রমীলাকে পছন্দ করিয়াছে, এটা নিছক সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিমল কী বলিবে ? অধরের সঙ্গে কেন পৃথিবীর সেরা পাত্রের সঙ্গেও যে প্রমীলার বিবাহ হইতে পারে না, তার কারণটা খুলিয়া বলার উপায় নাই, বলিলেও লাভ নাই। এরা বুঝিবে না, শুধু চমকাইয়া উঠিবে, শুধু বিচার করিবে, শুধু যন্ত্রণা সহিবে। নগেনের লোভ দেখাইয়া অধরকে বাতিল করিবার পথ নাই—নগেন ও লাবণ্যের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র প্রমথের নামেই আসিয়াছে।

এ বিয়ে হয় না বাবা, কিছুতেই হয় না, জোর করিয়া এ কথা বলা ভিন্ন বিমলের কিছুই করিবার নাই।

কিছুই সে করিতে পারিল না। শুধু বলিল, তাড়াতাড়ি কোনো কথা দেবেন না বাবা। ভেবে দেখতে দিন।

ভাববার কী আছে ? তুই বড়ো খুঁতখুঁতে বিমল ! বউটা আত্মহত্যা করেছিল বটে, কিন্তু তাতে ওর কী দোষ ?

শান্তার কথা বিমল উল্লেখ করে নাই ! সে নীরবে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ঘরে জড়োসড়ো হইয়া প্রমীলা বসিয়াছিল। তার সমস্ত দেহটা যেন একটা করুণ জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।

গায়ের গেঞ্জিটা বিমল টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। শান্তার ঘরের দিকের জানালাটা বিমল আর খোলে নাই, অস্থিরভাবে সেই পর্যন্ত সে একটা পাক দিয়া আসিল। সে দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

তুই কিছু নোস মিলি—তুই শুধু উপলক্ষ। অধর আমাকে শাস্তি দিচ্ছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ও ভোলেনি। আমাদের মধ্যে মারা গেলি। আমাকে কষ্ট দেবার জন্য শান্তার মতো তোকেও একটু একটু করে ভাঙবে।

প্রমীলা পাংশু মুখে বলিল, বাবা শুনল না ?

কেন শুনবে ? বাবা কী জানে ! তোর ভালোর জন্য বাবা তোকে হাসিমুখে ওর জাঁতিকলের মধ্যে ফেলে দেবে। বাবা কী জানে, বাবার কী দোষ ?

প্রমীলা সভয়ে বলিল, তবে কী হবে ?

তাই ভাবছি।

দুজনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শেষে প্রমীলা উঠিল। বলিল, যাই, বাবার অফিসের বেলা হল। ভয়ানক কিছু কোরো না দাদা।

না। কিন্তু তুই ভাবিসনে মিলি। অধরকে এবার আমি জিততে দেব না। বুঝলি, ভাবিসনে।

প্রমীলা চলিয়া যাইতেছিল, কথা বলার জন্য একটু দাঁড়াইল।

আমি আর ভাবি না দাদা। আমার ভাবনার শক্তি নেই।

তুই কী হাল ছেড়ে দিলি না কি ?

হাল আবার কবে ধরলাম যে ছেড়ে দেব ?

বিমল ঠোঁট কামড়াইল। তার আশ্বাসে প্রমীলা বিশ্বাস করে নাই, নিজের অদৃষ্টকে ও চিনিয়াছে। ওর বিপদকে কেহ ঠেকাইতে পারে, এ কথা ও আর ধারণা করিতে পারে না।

বিমল গেঞ্জি পরিল, জামা গায়ে দিল। বিছানার তলা খুঁজিয়া ছ আনা পয়সা পকেটে নিল। তারপর নীচে নামিয়া গেল।

খাওয়ার পর প্রমথ আঁচাইতেছিল। বলিল, শোন বিমল, শুনে যা।

বিমল দাঁড়াইল।

তুই অমত করছিস কেন ? মেয়েটা কাছাকাছি থাকবে, যখনতখন আসতে পাববে—দূরে বিয়ে হওয়া কি ভালো ! বুঝিস না ?

বিমল বলিল, তাতে কী ?

প্রমথ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সর্বদা আসা-যাওয়া করতে পারবে, এটা তুই ভালো বলিস না ! কীরকম সব খেয়াল তোর কিছু বুঝি না বাপু।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সদাগরি আপিস, মাসিকের আপিস, খবরের কাগজের আপিস কোথাও ঘুরিতে বিমল বাকি রাখিল না। শেষে রাত্রি নটার সময় একটা দৈনিকের আপিসে প্রুফ দেখার কাজ জোগাড় করিয়া বাড়ি ফিরিল। মাহিনা সাতাশ টাকা।

দরজা খুলিল প্রমথ। একটু ভীতস্বরে বলিল, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই সারাদিন কোথায় ছিলি ?

এমনি ঘুরছিলাম।

প্রমথ ইতস্তত করিয়া বলিল, অধরকে পাকা কথা দিয়ে দিলাম।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

তোর মতঅমত কোনো কিছুই বললি না। কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই হোক, তাতে বিয়ে আটকাবে কেন ?

বিমল সারা বাড়ি প্রমীলাকে খুঁজিল। রান্নাঘরে ভাত-তরকারি ঢাকা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রমীলা নাই। সব ঘরগুলিতে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া সে ছাদে গেল।

চিলকুঠির গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত ছাদটা একবার চক্র দিয়া আসিয়া উঠানের দিকে আলিসার উপর ঝুঁকিয়া প্রমীলা কয়েক মুহূর্ত নীচের অন্ধকারের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ছিটকাইয়া ছাদের মাঝখানে সরিয়া আসিতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া কী যেন সে ভাবিল। হঠাৎ সোজা আগাইয়া গিয়া আলিসার উপর উঠিবার চেষ্টা করিল।

বিমল আগাইয়া গেল। শক্ত করিয়া তার হাত ধরিয়া ছাদের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, এর মানে ?

প্রমীলা জড়ানো গলায় বলিল, প্রলোভন জয় করছিলাম দাদা।

বিমল তার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল, এ-সব প্রলোভনের সঙ্গে খেলা করতে নেই মিলি। হঠাৎ প্রলোভনের জয় হয়ে যায়। আলসের ওপরে উঠে দাঁড়ালে মানুষের মাথা ঘুরে যায়, শেষে কোনদিকে জয়, কোনদিকে পরাজয় খেয়াল থাকে না।

প্রমীলা অস্পষ্টভাবে বলিল, সেই তো ভালো দাদা। আত্মহত্যার পাপ হয় না।

কে বললে হয় না ? তোর মতো মনের অবস্থা নিয়ে আলসেয় উঠে দাঁড়ালে আত্মহত্যার পাপ হয়।

প্রমীলা তর্ক করিল।

কিন্তু সে রকম কোনো ইচ্ছা না নিয়ে যদি উঠি ? অনিচ্ছায় মাথা ঘুরে যদি উঠোনে পড়ে যাই ?

তাতে বেশি পাপ হয়। আত্মপ্রবঞ্চনার পাপ হয়। নে, নীচে চল।

প্রমীলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলো।

দোতলায় নামিয়া বিমল বলিল, তুই যদি বলিস তবে আর ছাদের দরজায় তালা দিই না।

থাক।

আয় আমার ঘরে। খেয়েছিস ?

না।

খেয়ে কাজ নেই। অসুখ করবে।

ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বিমল দেখিল, প্রমীলার হাঁটু ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

নে, শুয়ে পড়।

প্রমীলার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, বলা মাত্র বিছানায় উঠিয়া শান্তভাবে শুইয়া পড়িল।

বিমল বলিল, শোন, তোর কোনো ভয় নেই। আমি তোর সব ভার নিলাম।

সব ভার নিলে ?

হ্যাঁ। শান্ত হয়ে ঘুমো।

প্রমীলা চোখ খুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আমাদের এমন হল কেন দাদা ? তোমার আর আমার ?

এ রকম হয়।

বিমল বাইরে চলিয়া গেল। এক গ্লাস জল আনিয়া প্রমীলার শিয়রে রাখিতে গিয়া দেখিল ইতিমধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তারপর অনেক রাত্রে বিমল একবার ঘরে গেল। বালিশের তলা হইতে ব্যান্ডেজটা বাহির করিয়া নিল। এটা রাখিলে চলিবে না। তার অনেক কাজ।

প্রমীলা পাশ ফিরিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, কী দাদা ?

কিছু না। ঘুমো।

নীচে গিয়া উঠানের একপাশে ব্যান্ডেজটা বিমল পুড়াইয়া আসিল। বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িল।